প্রথম সংস্করণ : বৈশাখ, ১৩৫৪

প্রকাশক :
শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড
৩৩, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ
শ্রীহরি প্রেস
১৩৫এ, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট
কলিকাতা-৭

প্রচ্ছদপট
শ্রীমনোজ বিশ্বাস

পাঁচ টাকা

শ্রীমান রঞ্জনকুমার চক্রবর্ত্তী

স্নেহাস্পদেষু

—লেখকের অন্যান্য বই—

লৌহকপাট ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পর্ব	সহচরী
লৌহকপাট (চার খণ্ড একত্রে)	স্বীকৃতি
তামসী	মহাশ্বেতার ডায়েরী
পাড়ি	নিঃসঙ্গ পথিক ১ম ও ২য় পর্ব
ন্যায়দণ্ড	উত্তরাধিকার
মসিরেখা	ভুল
ছায়াতীর	নিশানা
আশ্রয়	অনির্বাণ
একুশ বছর	জরাসন্ধ বিচিত্রা
ছবি	নদীর এপার কহে
বন্যা	একটি রেখা
পরশমণি	তৃতীয় নয়ন
অন্বেষণ	এ বাড়ি ও বাড়ি (নাটক)
দেহশিল্পী	॥ কিশোর সাহিত্য ॥
জায়গা আছে	রংচং
পসারিণী	যমরাজার বিপদ
মল্লিকা	গল্প লেখা হল না
নমিতা	মংলী
অপর্ণা	জরাসন্ধের ছোটদের শ্রেষ্ঠগল্প
মানসকন্যা	জরাসন্ধের ছোটদের প্রিয় গল্প
চলন্তি মেঘের ছায়া	জরাসন্ধের শ্রেষ্ঠগল্প

॥ এক

'কই, কোথায় গেলে ?'

গাড়ি থেকে নেমে বাড়ি ঢুকতে ঢুকতেই হাঁক দিলেন প্রাণতোষ-বাবু। বড় বেশী ব্যস্তবাগীশ। যখন যা নিয়ে পড়েন তৎক্ষণাৎ ফয়সালা না করে ছাড়েন না।

প্রমীলা সেটা বিলক্ষণ জানেন। রান্নাঘর থেকে সাড়া দিলেন, 'এই যে, আমি এখানে।'

ওখানে কী করছ ? শোনো, দরকারী কথা আছে।

বলতে বলতে কাপড় ছাড়বার ঘরে গিয়ে বসলেন। মিনিট খানেক যেতেই আবার জরুরী তাগিদ—কী হল ?

প্রমীলা এলেন। দুহাত ভরা আটা।

স্ত্রীর দিকে না তাকিয়েই বলে উঠলেন প্রাণতোষ, অতীশদের ওখান থেকে ঘুরে এলাম। ওর মা তো শুনে একেবারে—এ কী ! তুমি আটা মাখছ ! ঠাকুর কোথায় গেল ?

আসেনি।

কেন ?

তা কেমন করে বলবো ?

আসেনি যখন, বিস্কুট-টিস্কুট দিয়ে চা খেয়ে নেওয়া যেত। লুচি পরোটা করতেই হবে এমন কী কথা আছে ?

তুমি যা বলছিলে, বল। আর যদি আধ-ঘণ্টাটাক দেরি করলে চলে ওদিকটা সেরে আসতাম।

তাই যাও। রান্না ঘরে যখন একবার ঢুকেছ—

বলে অগত্যা টাইএর ফাঁস আলগা করতে লেগে গেলেন প্রাণতোষ।

এ সংসারে লুচি (কোন কোন দিন পরোটা) এখনো বৈকালিক জলখাবারের প্রধান আসন আঁকড়ে ধরে আছে।

কোর্ট থেকে ফিরে 'কত্তার' পুরো এক থালা চাই। মেয়েরও এক ডিস বরাদ্দ। সেখানে অবশ্য প্রমীলাকে মাঝে মাঝে খানিকটা জোরজুলুম চালাতে হয়।

সেই দশটার সময় দুহাতা ভাত নাকে মুখে গুঁজে ইউনিভার্সিটিতে ছোটে। ফিরতে পাঁচটা। তখন ভারী কিছু পেটে না পড়লে শরীর টিকবে কেন? বাড়ের মুখ।

কিন্তু ঐ যে এক কঠিন রোগে ধরেছে একালের মেয়েগুলোকে —বিশেষ করে যারা স্কুল-কলেজে পড়ে—'সিলিম' হতে হবে, তার ছোঁয়াচ এড়াবে কেমন করে? চারখানার জায়গায় পাঁচখানা লুচি দিলেই মুখ কাঁচুমাচু—'আর পারছিনে মা।'

কোন কোন দিন কিছুতেই খাওয়ানো যায় না। দলে পড়ে কোথায় কোন রেস্টুরেণ্ট ফেস্টুরেণ্টে কি সব ছাইভস্ম গিলে আসে। সেদিন রাত্রেও পেট ভরে খায় না।

প্রমীলা বারবার নিষেধ করেছেন, ওসব খাসনে। কে শোনে?

তাদের কাল তো নয়। গুরুজন যা বলবেন তার উপরে আর কথা নেই। এটা হচ্ছে না-শোনার, না-মানার যুগ। যতই চেঁচিয়ে মর, ওরা ওদের পথে চলবে।

তাই প্রমীলা মেয়ের চলাফেরা খাওয়া পরা নিয়ে খিটমিট করেন না।

তার বাবা অবশ্য মেয়েকে অতটা অবাধ স্বাধীনতা দেবার

পক্ষপাতী নন। তবে এদিকে নজর দেবার সময় বড় একটা পান না।

সকালে উঠেই একরাশ মক্কেল নিয়ে পড়েন। তারপর হন্তদন্ত হয়ে কাছারি। ফিরে এসেই চা-টা খেয়ে একটু বিশ্রাম। সন্ধ্যার পর আবার মক্কেল।

কত্তা অপেক্ষা করে আছেন। তাঁর জন্যে তাড়াতাড়ি কয়েক-খানা লেচি বেলে নিয়ে উনুনে কড়া চাপিয়ে দিলেন প্রমীলা। বেশী দেরি হলে আবার হাঁক-ডাক শুরু করবেন।

চা খেতে খেতেই প্রাণতোষ মুলতুবী কথাটা পাড়লেন—'অতীশকে তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই।'

তা কেন থাকবে না? এই তো ক' বছর আগে অ্যাপ্রেন্টিস ছিল তোমার কাছে।

হ্যাঁ, এরই মধ্যে মোটামুটি দাঁড়িয়ে গেছে। একটা কনসালটেশন নিয়ে এসেছিল সেদিন। তাতেই বুঝলাম বেশ খাটছে। নির্ঘাৎ শাইন করবে। চেহারাটাও বেশ ইমপ্রুভ করেছে দেখলাম। লম্বাটম্বা তো ছিলই। এবার গায়ে মাংস-টাংস লাগছে। সিলভার টনিক পড়লে যা হয়। তখনই হঠাৎ আইডিয়াটা মাথায় এল। দীপার সঙ্গে লাগিয়ে দিলে কেমন হয়? একটা বাড়িও রয়েছে কোলকাতায়। তেমন কিছু নয়। কিন্তু বাড়াতে কতক্ষণ?

বেশ তো, দীপাকে জিজ্ঞেস করে ছাখ। ওর আবার পছন্দ হবে কিনা।

কেন, অপছন্দের কী আছে?

আমাদের কাছে না থাক, মেয়ে বড় হয়েছে, ওর ইচ্ছেটাই আসল। তাছাড়া—

প্রমীলা থামতেই প্রাণতোষ একটু অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠলেন, কী তাছাড়া ?

আসছে বছর পরীক্ষা। এখন বিয়ের কথা পাড়লে—

আহা, এখনই বিয়ে দিতে হবে কে বলছে? কথাবার্তা হতে দোষ কী ?

প্রমীলা তখনো চুপ করে আছেন দেখে প্রাণতোষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, মেয়ের কথা পরে শোনা যাবে। তোমার যেন তেমন ইচ্ছে নেই বলে মনে হচ্ছে।

না, না, তা কেন হবে ? আমি ভাবছিলাম, দীপা আসছে বছর এম. এ. পাশ করবে। বলতে নেই, পড়াশুনোয় ভাল। ওর ইচ্ছে, আরো পড়ে, মানে রিসার্চের দিকে যায়। আর অতীশ তো শুধু বি. এ.। তাও—

কেন, এল. এল. বিটা কোথায় গেল ?

স্ত্রীকে কথাটা শেষ-করতে দিলেন না প্রাণতোষ।

প্রমীলা বলতে যাচ্ছিলেন, কোথায় এম. এ. আর কোথায় এল. এল. বি ? নিজেকে সামলে নিলেন। সামনে যিনি বসে তিনিও বি. এ. বি. এল। এম. এ-তে ভর্তি হয়েছিলেন, পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। তার আগেই প্র্যাকটিস শুরু করতে হয়েছিল।

গোড়ার দিকে, যেমন হয়ে থাকে, রোজগারপত্তর বিশেষ কিছু ছিল না। অনেক দিন ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। তারপর একটু একটু করে পসার জমেছে। ধীরে ধীরে স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে সংসারে। বাড়ি করেছেন, গাড়ি করেছেন।

প্রাণতোষ বোস এখন লিডিং অ্যাডভোকেটদের একজন। সুতরাং বি. এল বা এল. এল. বি-কে আর যেই তুচ্ছ করে দেখুক, প্রমীলা পারেন না।

তবু তাঁর যেন মনে হয় এর মধ্যে বিদ্যার জলুস নেই। নেহাৎই একটা প্রফেশন, ব্যবসা। একজন এম. এ-কে যেমন বিদ্বান বলে সবাই মেনে নেয়, এল. এল. বি-র বেলায় তা বলা যায় কি ?

এটা অবশ্য প্রমীলার নিজস্ব ধারণা। মেয়ে কি মনে করে তিনি জানেন না।

তবে এটুকু টের পেয়েছেন ওকালতি ব্যবসাটাকে দীপা তেমন শ্রদ্ধার চোখে দেখে না। হয়তো তার কোন বিশেষ কারণ নেই। কোন জিনিসের সঙ্গে অতি-অন্তরঙ্গতার ফলে যে বিরাগের সৃষ্টি হয় এর মূলেও তাই।

বাবা উকিল। ছেলেবেলা থেকে দেখে দেখে পেশাটার উপরেই 'ভক্তি চটে যাওয়া' গোছের একটা ভাব এসে গেছে। তিনি যদি ডাক্তার হতেন হয়তো ডাক্তারির উপরেও ঐ একই মনোভাব দেখা দিত। এটাই বোধহয় সাধারণ নিয়ম।

ছেলেও তো বাপের লাইনে গেল না। ওঁর খুব ইচ্ছা ছিল। বলতেন, সব প্রফেশনেই মেরিট্‌স্ চাই। তার ওপরে, বিশেষ করে গোড়ায় যেটা দরকার, সে হচ্ছে ব্যাকিং। ওকালতির বেলায় সেটা আরো সত্যি। আমার জীবনে তার অভাব ছিল বলে অনেক স্ট্রাগল করতে হয়েছে। ওর আর সে সমস্যা নেই। আমিই দাঁড় করিয়ে দেবো।

কিন্তু প্রবীর রাজী হয়নি। আই. এস. সি-তে ভাল নম্বর পেয়েছিল। বাপ বললেন, বি. এস. সি বা বি. এ পড়।

সে শিবপুরে গিয়ে ভর্তি হল। পাশ করে নিজের চেষ্টায় চাকরি যোগাড় করে বাইরে চলে গেছে।

হঠাৎ মনের উপর একটা ম্লান ছায়া পড়ল প্রমীলার। বেশ কিছুদিন হয়ে গেল খোকার চিঠি আসেনি।

একটু বোধহয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। কত্তার কথায় সজাগ হয়ে উঠলেন।

'আসলে কি জান?'

বেশ জোর দিয়ে বললেন প্রাণতোষ, 'মেয়েদের যেমন বিয়ে হয়ে গেলেই মুড়ি-মিছরি এক দর, কে গ্রাজুয়েট আর কে নন-ম্যাট্রিক বুঝবার উপায় নেই। তার ওপরে একটা বাচ্চা এল তো সবারই গতি ঐ ন্যাতা-ক্যাথা আর ফীডিং বটল, ছেলেদেরও তেমনি কোনো একটা লাইন ধরবার পর ডিগ্রি ফিগ্রির কথা কেউ মনে রাখে না। তখন লোকে শুধু দেখে কে কিরকম করছে, কে কত কামাচ্ছে। সে দিক থেকে অতীশ ছেলেটা কোনো মেয়েরই পাত্তর হিসেবে ফ্যালনা নয়।

'ফ্যালনা কেন হবে? আমি মোটেই তা বলিনি।'

সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন জানালেন প্রমীলা। 'তাছাড়া এতদিন ধরে দেখেছি তো। ছেলেটির স্বভাব টভাব ভাল।'

আমি সেটা আরো কাছ থেকে ভাল করে দেখেছি। বাজিয়ে দেখা যাকে বলে।

'ওর মা কী বললেন?' জানতে চাইলেন প্রমীলা।

একেবারে এককথায় রাজী। বললেন, ওর বাপ নেই, আপনিই ওর অভিভাবক। আপনার হাতেই ও মানুষ। আপনি যা বলবেন, তার ওপরে আমার আর কী বলবার আছে?

প্রমীলার আরো কিছু জানবার ছিল। বললেন, দীপার সম্বন্ধে কোনো কথা হল না?

কী কথা? দীপার নাড়ি নক্ষত্তর সবই তো ওঁরা জানেন।

তা হলেও ও একটু আজকালকার ধরনে মানুষ। বিয়ের পরেও যদি পড়াশুনো করতে চায় তা নিয়ে আবার আপত্তি হবে না তো?

কিসের আপত্তি ? ও'র দুটো মেয়েও তো স্কুল কলেজে পড়ছে।

মেয়ে পড়ছে আর বৌ পড়তে যাচ্ছে, এ দু'য়ের মধ্যে অনেক তফাৎ। প্রমীলা সেটা বলতে গিয়েও বললেন না।

বোঝা গেল দীপাকে নিয়ে কোন কথা হয়নি। কত্তা সে দিক দিয়ে যাননি। অভিভাবকের সনদ পেয়ে মনে করেছেন, বাকী সব প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেছে। কিন্তু প্রমীলার মায়ের মন অতটা নিশ্চিন্ত হতে পারল না। প্রশ্নটা রয়ে গেল।

তার একটি মাত্র মেয়ে। একটু বেশী খেয়ালী আর অভিমানী। কি জানি কী চোখে দেখবেন ওঁরা ?

তার চেয়েও বড় প্রশ্ন অতীশের সম্বন্ধে দীপার মনোভাব।

সে যখন কত্তার কাছে আসত, তখন মাঝে মাঝে দুজনের দেখা হয়েছে। এক আধটু মেলামেশাও যে হয়নি তা নয়। ও তখন সবে স্কুল থেকে বেরিয়েছে। নেহাৎ ছেলেমানুষ।

তারপর এতগুলো বছর। সে সময় যদি এক আধটু ভাব-সাব হয়েও থাকে এতদিনে সেটা টিকে থাকবে মনে হয় না। দেখাশুনোটা যদি ওরা চালিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে অবশ্য অন্য কথা।

কিন্তু সে রকম কিছু হলে তিনি জানতে পারতেন। মেয়ে স্পষ্ট করে না জানালেও তার চোখে মুখে হাবভাবে কথাবার্তায় আভাস পেতেন।

যাই হোক হাতে পাঁজি মঙ্গলবারের কী দরকার ? দীপার কাছে সোজাসুজি কথাটা পাড়লেই বোঝা যাবে।

॥ দুই ॥

ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে কলরব করতে করতে নেমে এল ওরা।

সেই পাঁচজন। রোজ না হলেও প্রায়ই যাদের দেখা যায় এক সঙ্গে। এক ইয়ারের ছেলে-মেয়ে, সাবজেক্ট এক নয়। ক্লাসের সময়ও আলাদা।

তবে আগে থেকেই ঠিক করা আছে, যখনই যে ফ্রী হবে সোজা চলে আসবে লাইব্রেরীতে। একটা কোণও মোটামুটি বেছে নেওয়া আছে।

দু-একখানা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করবে যতক্ষণ সবাই এসে না জড়ো হয়। তার পরেই বেরিয়ে পড়া।

না, কফি হাউসের আড্ডায় ওদের দেখা যাবে না। বড় হট্টগোল। ওখানে ওদের পোষায় না। পাঁচজনে একাকী হবার সুবিধা নেই।

তার বদলে গোলদীঘির বেঞ্চি কিংবা শেডগুলা অনেক পছন্দসই। তবে জায়গা মেলা ভার। একটু বেলা পড়তেই নিষ্কর্মা বৃদ্ধের দল সেগুলো দখল করে বসেন। কাজেই ওরা চলে যায় চৌরঙ্গী পাড়ায়।

অবস্থার দিক দিয়ে পাঁচজনই মোটামুটি একরকম। যাকে বলে মধ্যবিত্ত। তারই মধ্যে কিছুটা ইতর বিশেষ হয়তো আছে।

পকেট কারোরই পুষ্ট নয়। কাফে-ডি-মণিকা কিংবা ঐ গোছের কোন সস্তা রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসে। লেডিস-মার্কা পরদা

ঘেরা খোপই একটা বেছে নেয়। কোনো বাধা নেই। পাঁচ জনের দুজন তো মেয়ে।

ঐ দিন কলেজ স্ট্রীটে পড়তেই দীপা বলল, তোমরা থাক। আমাকে আজ সকাল সকাল বাড়ি ফিরতে হবে।

কেন, দেখতে আসবে বুঝি? বলে উঠল কৃষ্ণা।

আমি তো তোর মত দর্শনীয় বস্তু নই।

কৃষ্ণা সত্যিই রূপসী এবং সে সম্বন্ধে বেশ সচেতন। বলল, আমাকে তো সবাই সব সময়ে দেখছে।

'এবং হাঁ করে,' ফোড়ন দিল প্রসূন।

সেটা অবিশ্যি তুমি—সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল কৃষ্ণা।

তারপর দীপার দিকে ফিরে বলল, তোকে দেখবে কোনো বিশেষ জন বিশেষ সময়ে, বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে।

রক্ষে কর, ওসব বিশেষ ফিশেষের মধ্যে আমি নেই।

তাহলে এত সাত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার তাড়া কিসের? জিজ্ঞাসা করল শোভন।

বাঃ, কোনো কাজ থাকতে নেই?

সেটাই তো জানতে চাই।

মা যেতে বলেছে।

কৃষ্ণা কলকণ্ঠে বলে উঠল, হুঁ, আমি ঠিক ধরেছি বাবা। না; তাহলে আর তোকে আটকাবো না। উইশ ইউ গুড লাক।

সো ডু উই।'

সঙ্গে সঙ্গে যোগ করল প্রসূন ও শোভন।

মানব ছিল পিছনে। তার দিকে ফিরে শোভন বলল, এই, তুই যে চুপ করে রইলি?

সে মৃদু হেসে বলল, মনে মনে বলেছি।

মুখে বলবার মত জোর পাচ্ছ না বুঝি ?

কৃষ্ণার প্রশ্ন শুনে ওরা দুজন হেসে উঠল। মানব কিছু বলল না।

দীপা ওখান থেকেই প্রেসিডেন্সি কলেজের দিকে এগিয়ে গেল। তাকে ওপারে গিয়ে ভবানীপুরের বাস কিংবা এস্প্লানেডের ট্রাম ধরতে হবে।

বাকী চারজন রাস্তা পার হয়ে কলেজ স্কোয়ারে গিয়ে ঢুকল।

শোভন যেতে যেতে বলল, দীপা তাহলে সত্যিই খসল ?

একটু যেন উদাস সুর লাগলো তার গলায়।

কৃষ্ণা তার সঙ্গে আরো কিছুটা কৃত্রিম উদাস রেশ মিশিয়ে বলল, হাউ স্যাড।

স্যাড কেন হবে ? উই আর অল হ্যাপী। কি বলিস প্রসূন ?

নিশ্চয়ই। একদিন পেট ভরে ভোজ খাওয়া যাবে। ওর বাবা খুব বড়লোক।

সবাই তোমার মত পেটুক নয়। খেতে পেলেই হল। কেউ কেউ হয় তো অন্য কিছু চায়।

বলে, শোভনের দিকে আড়চোখে তাকাল কৃষ্ণা। মুখের হাসিটি অর্থপূর্ণ।

লক্ষ্য করে প্রসূন বলল, তাই নাকি রে শোভন ? তা, এখনই ঘাবড়াচ্ছিস কেন ? ব্যাপারটা হয়তো সত্যিই কিছু নয়, স্রেফ কৃষ্ণার আন্দাজ।

শোভন জবাব দিল, সত্যি হোক, মিথ্যা হোক, আমার ও নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই। সে বরং আমাদের বন্ধুবর—আরে, সে কোথায় গেল ?

প্রসূনও পিছন ফিরে তাকাল। মানবকে দেখা গেল না।

না বলে কেটে পড়ল ?

কোনো 'গাঁয়ের নোকের' দেখা পেয়েছে হয়তো। আফটার অল গাঁইয়া তো। দেখে আসবো নাকি ?

বলে, শোভন একটু দাঁড়াতেই, কৃষ্ণা তার বাহু ধরে বলল, ধারে কাছে কোথাও থাকলে তো দেখবে ? চল।

বাস বা ট্রামের দেখা নেই।

দীপা যে তার জন্মে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল তা নয়। আসলে তার বাড়ি ফেরার কোন তাড়াই ছিল না। বন্ধুদের সঙ্গও ভাল লাগছিল না। মনটা একটু একা থাকবার সুযোগ খুঁজছিল। ভিতরে ভিতরে শুধু অস্বস্তি নয়, একটু যেন অসহায় বোধ করছিল, এতদিন যা করেনি।

এতগুলো বছর বেশ সহজ স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে চলাফেরা করে এসেছে। পড়াশুনো, বন্ধুদের সঙ্গে খানিকটা আড্ডা, এক-আধটু বেড়ানো, মাঝে মাঝে দু-একটা সিনেমা—এই নিয়েই চলছিল দিনগুলো।

বাবা-মার সঙ্গে যেটুকু সম্পর্ক, তাও একরকম রুটিন-বাঁধা। খাওয়া নিয়ে মার কাছ থেকে এক আধটু বকুনি খাওয়া, কখনো-সখনো বাড়ি ফিরতে দেরি করলে কিছুটা অনুযোগ। বাবার সামনে পড়ে গেলে—'কেমন আছ মা-মণি? কিংবা পড়াশুনো করছিস তো ঠিক মত?'

ব্যাস, ঐ পর্যন্ত।

ছোটোখাটো ব্যাপারে মতের অমিল যে হয়নি কখনো, বিশেষ করে বাবার সঙ্গে, তা নয়। কিন্তু তা নিয়ে কোনো তরফে কোনো অভিযোগ ছিল না। মেয়ে মনে করেছে, বাবা সেকেলে মানুষ,

উনি তো এই রকমই বলবেন। বাবা ভেবেছেন, এরা সব আজ-কালকার ছেলে মেয়ে, ওরকম একটু হবেই।

কিন্তু কালকে যা ঘটে গেল তার চেহারা একেবারে আলাদা।

শুরু হয়েছিল পড়াশুনো নিয়েই।

প্রাণতোষ তার বসবার ঘরে একা। মক্কেল টক্কেল ছিল না। দীপা যাচ্ছিল দরজার সামনে দিয়ে। তা রাত একটু হয়েছিল বৈকি। সাতটা বেজে গেছে।

প্রাণতোষ ডাকলেন, এদিকে শোন।

দীপা এসে দাঁড়াল টেবিলের ওধারে।

রোজই এমনি দেরি হয় নাকি ফিরতে?

না; আজ একটু হয়ে গেল। লাইব্রেরীতে ছিলাম।

একটু সত্য-গোপন হল। লাইব্রেরীর পরে ঐ পাঁচ বন্ধুতে যথারীতি বেরিয়েছিল ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকে।

প্রাণতোষ বললেন, পরীক্ষা তো এসে গেল। লাস্ট এগজামিনেশন। এর ওপরেই সব। অবিশ্যি ভালোই করবে জানি। তবু জিজ্ঞেস করছি, ঠিকমত তৈরি টৈরি হচ্ছিস তো?

—চেষ্টা তো করছি।

—কোনো হেলপ্ টেলপ্ দরকার হলে বলিস। একজন ভাল প্রফেসর রেখে দেওয়া যাবে।

—এখনো তেমন দরকার বোধ করছি না। করলে বলবো।

—হ্যাঁ, আর একটা কথা। বোস্।

—অতীশকে মনে আছে তো?

—আছে বৈকি?

—খুব ভাল করছে বার্ এ।

—করাই তো উচিত। তা না হলে আপনারই দুর্নাম।

বলে, হাসল দীপা। প্রাণতোষ মনে মনে খুশী হলেন। মুখে অবশ্য বললেন, আমি আর কী করেছি? একটু শুধু গাইড করা। বাকীটা ওর নিজের। ওরা আমাদের পাল্‌টি ঘর। আমার ইচ্ছা, তোর মারও সেই মত, তোকে ওর হাতে দিই। সম্পর্কটা বরাবরের মত পাকা হয়ে যাক।

দীপা যেন হঠাৎ আকাশ থেকে পড়ল। এ রকম একটা প্রস্তাবের জন্যে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। এদিক দিয়ে কিছু ভাবেও নি। তাই সঙ্গে সঙ্গে কোন উত্তর দিতে পারল না।

তার চোখের দিকে যদি একবার চেয়ে দেখতেন প্রাণতোষ, হয়তো ধরতে পারতেন, মেয়ে যে চুপ করে আছে, তার কারণ, ব্যাপারটা এমন আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত যে তার বিহ্বলতা তখনো কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

তিনি অন্য ধরনের লোক। নিজের ঝোঁকে চলেন। উত্তর না পেয়ে বরং নিজের দিকটাই আরো খুলে বলবার জোর পেলেন—

'জানিস তো, আমি গোড়া থেকেই ভেবে রেখেছিলাম, খোকা এসে আমার জায়গায় দাঁড়াবে। সেইটাই তো স্বাভাবিক। তার পছন্দ হল না। একেবারে দেশ ছেড়ে চলে গেল। আমার এই অনেক কষ্টের অনেক পরিশ্রমের তৈরি পসার নষ্ট হয়ে যাবে তাতো হতে পারে না। তাই ঠিক করেছি অতীশকে এনে বসাবো এখানে। সেই আমার ছেলের স্থান পূর্ণ করবে। তার নিজেরও খুব ইচ্ছা। আর পাত্তর হিসেবেও—'

ওসব কথা এখন থাক বাবা।

কথার মাঝখানেই বলে উঠল দীপা। তার মধ্যে বিরক্তির সুরটা চাপা রইল না। হয়তো তার কারণও ছিল। বাবার কথার ধরন থেকে তার একটা কথাই মনে হল, এ ব্যাপারে তাঁর এবং

অতীশের ইচ্ছাটাই আসল, তার কাজ শুধু সেই ইচ্ছাকে পূরণ করা। তাছাড়া তার যেন আর কোন ভূমিকা নেই। একজনের তৈরি পসার আর একজনের হাতে গিয়ে পড়বে। সে শুধু তার পথ করে দেবে।

প্রাণতোষ সব বিষয়েই তড়বড়ে। মেয়ের স্বার্থ ও মঙ্গলের দিকটা তিনি নিশ্চয়ই উপেক্ষা করেন নি। কিন্তু এমন তাড়াহুড়ো করে এবং ঠিক এইভাবে যদি কথাটা না পাড়তেন হয়তো ব্যাপারটা অন্য রকম রূপ নিত। এখন যে দিকে মোড় নিল তাকে ঠিক প্রীতিকর বলা চলে না।

প্রাণতোষ বাধা পেয়ে অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। একটু রুক্ষ-ভাবেই বললেন, কেন, থাকবে কেন? আমি তো বলছি না, আজই তোমাকে বিয়ের পিঁড়িতে গিয়ে বসতে হবে। আমাদের ইচ্ছেটা জানিয়ে দিলাম। তোমাকে সেটা ভেবে দেখতে হবে। আশা করি তা দেখবে।

বলে, ও প্রসঙ্গের ওখানেই সমাপ্তি টেনে দিয়ে পাশ থেকে একটা ব্রীফ টেনে নিলেন।

দীপাও নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। একটু পরে প্রমীলা এলেন চা খাবার নিয়ে। কপাটে ঘা দিতেই ভিতর থেকে বলল, এখন কিছু খাবো না।

কেন, খাবি না কেন? সেই কখোন দুমুঠো ভাত খেয়ে বেরিয়েছিস।

বাইরে খেয়ে নিয়েছি।

প্রমীলা আর পীড়াপীড়ি করলেন না। এ রকম মাঝে মাঝে হয়ে থাকে। ফিরতে দেরি হলে জলখাবারটা বাইরেই খেয়ে

নেয় কোনোখানে। তারপর রাত্রে একেবারে ভাতের পাতে গিয়ে বসে।

আজ অবশ্য তা হয়নি। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মাঠে বসে চিনেবাদাম দিয়েই বৈকালিক আহার সেরে নিয়েছিল সবাই। বেশ খিদে নিয়েই ঢুকেছিল বাড়ি।

তারপর বাবার ঘরে যা ঘটল তাতেই সে সব কখন উড়ে গেছে।

রাত সাড়ে নটায় অবশ্য মার ডাকাডাকিতে খাবার টেবিলে গিয়ে বসতে হয়েছিল। বাবা আগেই খেয়ে নিয়েছেন।

প্রমীলা খেতে খেতে প্রশ্ন করলেন, কী বলছিলেন উনি?

দীপা মাথা না তুলেই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, আরেক দিন শুনো।

প্রমীলা আঁচ করলেন একটা কিছু ঘটেছে এবং ও নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করলেন না।

অতীশকে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল দীপা। অনেক দিন দেখা নেই। তার শিক্ষানবিসি শেষ হবার পর এ বাড়িতে বড় একটা আসে নি। এলেও প্রাণতোষের সঙ্গে কথা বলে চলে গেছে।

যখন নিয়মিত আসত, তখনও বাড়ির ভিতরে ক্বচিৎ দেখা যেত তাকে। নিজে থেকে আসত না।

কখনো-সখনো মা ডেকে পাঠিয়ে খোঁজ খবর নিতেন কিংবা কোন একটা উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন।

দীপার সঙ্গে সামান্য দু-একটা মামুলী কথাবার্তা ছাড়া আর কোন যোগাযোগ ছিল না।

কিন্তু এত কাছে এই প্রিয়দর্শন শান্ত মিষ্টভাষী বুদ্ধিমান যুবকটি সম্বন্ধে সে যে একেবারে উদাসীন ছিল তা বলা চলে না। পনর ষোল বছরের কোন মেয়েই বোধ হয় থাকে না।

কিন্তু ওদিক থেকে কোন উৎসুক দৃষ্টি বা বিশেষ মনোযোগের পরিচয় পাওয়া যায় নি। বরং মনে হয়েছে, ওর সম্বন্ধে সে একেবারে নির্বিকার।

একদিনের কথা মনে পড়ে। সন্ধ্যার পর শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো একখানা রহস্যোপন্যাস পড়তে শুরু করেছিল দীপা। মাঝ পথে থেমে যাবার উপায় ছিল না। একেবারে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে ব্যোমকেশ যখন তাকে মুক্তি দিল তখন রাত একটা বেজে গেছে।

সারা বাড়ি নিঝুম। ওর চোখ থেকে ঘুম চলে গেছে এবং সহজে আসবে বলেও মনে হল না। ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল।

হঠাৎ চোখে পড়ল বাবার চেম্বারে আলো জ্বলছে। অতি-ব্যস্ত মানুষ; নিশ্চয়ই নেভাতে ভুলে গেছেন মনে করে এগিয়ে গেল। দরজায় তালা লাগানো থাকে। সেদিন ছিল না। ভেজানো কপাট একটু ঠেলতেই খুলে গেল।

ঠিক সামনেই অতীশ একটা মোটা আইনের বই থেকে কি যেন লিখে চলেছে। মুখ তুলে তাকাল। ক্লান্ত মুখ, কাতর দুটি চোখ। প্রথমে বিস্ময় তার পরে কেমন মায়া হল দীপার—"এত রাত্রে কী করছেন এখানে বসে"!

অতীশ স্বভাবতই খানিকটা অপ্রস্তুতে পড়ে গেল। ম্লান হাসি দিয়ে সেটা ঢাকবার চেষ্টা করে বলল, একটা জরুরী কাজ দিয়েছেন স্যর। সকালেই চাই কিনা।

—তাই বলে সারা রাত জাগতে হবে নাকি? ক'টা বাজে জানেন?

অতীশ ঘড়ির দিকে তাকাল—'ওঃ, এত রাত হয়ে গেছে?'

বইটা বন্ধ করল। দীপা বলল, বাড়ি যাবেন কী করে? ট্রাম বাস্ তো সব বন্ধ হয়ে গেছে।

বাস্ হয়তো পাওয়া যাবে। না হলে হেঁটে চলে যাবো। বেশী দূর তো নয়।

বেশী দূর নয় মানে? আমি তো শুনেছি দু-মাইল, আড়াই মাইল হবে।

তা হোক। কতক্ষণ আর লাগবে?

খুব হয়েছে। যেতে হবে না বাড়ি। এখানেই শুয়ে পড়ুন। ওটাকে ঠিক করে নিন······

একটা সোফা-কাম-বেড ছিল দেয়ালের পাশে। সে দিকে আঙুল তুলল দীপা।

কিছু দরকার নেই। আমি ঠিক চলে যাবো।

আপনি বড্ডো বাজে তক্কো করেন। দাঁড়ান, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

নিজেই এগিয়ে গিয়ে সোফার সিটটাকে নামিয়ে স্ট্যাণ্ড দুটো লাগিয়ে দিয়ে বলল, দাঁড়ান আমি একটা বালিশ এনে দিচ্ছি।

কোন প্রতিবাদের অপেক্ষা না করেই বেরিয়ে গেল দীপা এবং ড্রইং রুম থেকে একটা তাকিয়া নিয়ে ফিরে এল—"এই দিয়েই চালিয়ে নিন আজকের মত। খাওয়া তো হয়নি। এক কাপ কফি আর খানকয়েক বিস্কুট এনে দিই? তাছাড়া তো এখন আর—"

অতীশ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, না, না; আমি খেয়ে এসেছি বাড়ি থেকে।

কখন খেলেন?

আটটায়, যেমন খাই। সাড়ে আটটা থেকে কাজ করছি।

—তাহলে শুধু এক কাপ কফি খান। ভাল ঘুম হবে।

কিচ্ছু দরকার নেই। শুয়ে পড়লেই ঘুম এসে যাবে।

তারপরেও একটুখানি অপেক্ষা করল দীপা। হয়তো মনে মনে

আশা করছিল অতীশ বলবে, বসো। জানতে চাইবে তুমি কী করছিলে এত রাত পর্যন্ত, কিংবা অন্য কোন কথা।

কিন্তু অতীশ কিছুই বলল না। কেমন যেন কুণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অর্থাৎ দীপা থাকাতে অস্বস্তি বোধ করছে, গেলেই শুয়ে পড়তে পারে। অন্তত তার ভাব দেখে তাই মনে হল।

যে কারণেই হোক রাগে অভিমানে তার তু'চোখ জ্বালা করে উঠল। লোকটা কি পাথর, না ইচ্ছা করে অবহেলা করছে তাকে ?

নিজের উপরেই ভীষণ রাগ হল। ঠিক হয়েছে। যেমন হ্যাংলার মত সেধে যেচে ঘরে এসে ঢুকেছিল, দরদ দেখিয়েছিল যেন কত না আপনজন, তেমনি ঠিক শাস্তি পেয়েছে। এ শুধু অবহেলা নয়, অপমান। সে তো একটা বাচ্চা মেয়ে নয় যে এমন করে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবে ঐ লোকটা। কালো কুচ্ছিৎ নয় যে ফিরে তাকাতে ঘেন্না হবে।

হঠাৎ বুকের ভিতর থেকে একটা তুর্বার কান্না গলা পর্যন্ত ঠেলে উঠল।

এক সেকেণ্ড দেরি না করে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল।

সেদিনের পর থেকে অতীশকে ইচ্ছা করে এড়িয়ে চলেছে। এমনভাবে চলাফেরা করত যেন কোথাও দেখা না হয়।

কিন্তু কী আশ্চর্য, তখনো একটা ক্ষীণ আশা ছিল, অতীশ হয়তো নিজে থেকে সুযোগ করে নিয়ে তাকে একবার ডাকবে বা দেখা করে বলবে, রাগ করেছ আমার ওপর ? কিংবা ঐ ধরনের কোন কথা।

তেমন কিছুই ঘটেনি। তারপর নিজেকে বুঝিয়েছে দীপা, আসলে অতীশ হচ্ছে সেই ধরনের যুবক যাদের একমাত্র লক্ষ্য একটা কেরিয়ার গড়ে তোলা। নিজেকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা। সারা

মনপ্রাণ সেইদিকে নিবদ্ধ। তার বাইরে তাদের কোন অস্তিত্ব নেই।

স্কুলের বইতে পড়া সেই লাইনটা মনে পড়ল—অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।

অতীশ সেই প্রাজ্ঞজনের একজন।

বাবা বলেছিলেন, এ বিয়েতে তারও খুব ইচ্ছা। তাই যদি হয় সে ইচ্ছার মূলেও ঐ কেরিয়ার। দীপার উপর তার কোন আকর্ষণ নেই। তাকে চাইছে তার জন্যে নয়। তাকে পেলে তার বাবার আনুকূল্য পুরোপুরি লাভ করা যাবে, এই জন্যে।

সে যেন একটা সিঁড়ি, উপরে উঠবার জন্যে যাকে ব্যবহার করতে চায় অতীশ। প্রাণতোষ তাকে সেই 'আরোহণে' সাহায্য করছেন।

ইংরেজিতে যাকে বলে 'climb' সাধারণ অর্থে নয়, বিশেষ অর্থে।

বাবাকে সে চেনে। মেয়ের মন কী চায় না চায়, সে সব তাঁর বিবেচনার বিষয় নয়। তার মঙ্গলই একমাত্র কাম্য। সে প্রতিষ্ঠিত হোক, তার ভবিষ্যৎ নির্বিঘ্ন হোক, এইটাই তিনি চান এবং সে দিক থেকে বিচার করলে কন্যার পাত্রনির্বাচনে তিনি সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। অতীশ সব দিক দিয়েই সুপাত্র। চেহারা, স্বাস্থ্য, স্বভাবচরিত্র, রোজগার সবটাই ভাল এবং শেষের অঙ্কটা ক্রমবর্ধমান।

বাবা যে প্রায়ই বলে থাকেন, ছোকরা শাইন করবে, তার পরিচয় প্রতিদিন পাওয়া যাচ্ছে।

সুতরাং বাবার কাছে দীপার কিছু বলবার নেই। তাঁর পথ যুক্তির পথ। তার বাইরেও যে কিছু আছে, সাধ আকাঙ্ক্ষা,

ভালোলাগা, মন্দলাগা তাকে তো যুক্তি হিসাবে দাঁড় করানো যাবে না।

মা হয়তো কিছুটা বুঝবেন। বুঝলেও কোন লাভ নেই। তাদের সংসারে মার কোন নিজস্ব অস্তিত্ব নেই। মেয়েকে তিনি ভালবাসেন, তার সুখদুঃখ অনুভব করেন কিন্তু সেদিকে চেয়ে বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজেকে দাঁড় করাবার মত তাঁর না আছে সাহস না আছে ক্ষমতা।

এখনো মার সঙ্গে তার কোন কথা হয়নি। প্রমীলার প্রশ্নের উত্তরে শুধু বলেছে, পরে শুনো।

সে নিজে না বললেও বাবার কাছ থেকে সবই তাঁর শোনা হয়ে গেছে। সে আর নতুন করে কী বলবে? বললেও, অর্থাৎ মেয়ে মনে-প্রাণে এ বিয়েতে সায় দিচ্ছে না জেনেও 'কী আর করবি বল?' এই গোছের একটা অসহায় উক্তি ছাড়া সে মার কাছ থেকে আর কিছু আশা করে না।

কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে এই সব ভাবনা যখন দীপার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল এবং ভিতরে ভিতরে সে নিজেকে বড় নিরাশ্রয় বোধ করছিল, তখন উল্টো দিকের ফুটপাথে তারই মত ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল মানব। গোড়া থেকেই লক্ষ রেখেছিল ওর দিকে। এবার রাস্তা পার হয়ে পাশে এসে দাঁড়াল —"কী হল? বাড়ি যাবে না?"

দীপা তাকে আগে দেখতে পায়নি। হঠাৎ চমকে উঠল। মৃদু হেসে বলল, যাবো; ট্রামের জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।

ট্রাম তো চলে গেল।

বড্ড ভিড়। ওঠা যেতোনা।

আসলে নিজের মধ্যে এমন নিমগ্ন হয়ে ছিল যে ট্রামটা দীপার নজরে পড়েনি। মানব সেটা বুঝল। কিন্তু তা নিয়ে কিছু বললনা।

ওর মুখের দিকে চেয়েই ধরতে পেরেছিল, যে-কোন কারণেই হোক মনটা ঠিক স্ব-বশে নেই। ভিতরে ভিতরে হয়তো কিছু একটা দ্বন্দ্ব চলছে।

একবার ভাবল জানতে চাইবে। কিন্তু কিভাবে কথাটা পাড়া যায় হঠাৎ ভেবে পেল না।

দীপা বলল, তুমি ওদের সঙ্গে গেলে না ?

না।

কেন ?

সব সময়ে হৈ-চৈ ভাল লাগেনা।

দীপা কিছু বলল না। মানব যে ওদের সকলের থেকে একটু অন্য ধরনের তা সে জানত। সব চেয়ে কম কথা বলে এবং তার মধ্যে চটক দেবার চেষ্টা নেই।

শোভন ও প্রসূন—দুজনেই কোলকাতার ছেলে। তাদের চেহারায় সাজ-পোশাকে কথাবার্তায় একটা শহুরে পালিশ ফুটে বেরোয়।

মানব মফঃস্বলের ছেলে। হেতম্‌পুরের মত একটা গ্রাম্য কলেজ থেকে বি. এ পাশ করে ইউনিভার্সিটিতে এসে ভর্তি হয়েছে, কেবলমাত্র রেজাল্টের জোরে। হাই সেকেণ্ড ক্লাস পেয়েছিল ইংরেজিতে। পেটে বিদ্যা আছে, মগজে বুদ্ধি আছে। সেটা অনেকখানি প্রচ্ছন্ন। বাইরে থেকে টের পাওয়া যায় না। ইংরেজিতে যাকে স্মার্ট বলে তা তো নয়ই, শার্পও বলা চলে না। বরং একটু ভোঁতা ধরনের ভালো মানুষ। কথায় রাঢ় অঞ্চলের টান স্পষ্ট এবং সেগুলো শোধরাবার চেষ্টাও তেমন নেই।

বন্ধুরা তা নিয়ে ঠাট্টা-কৌতুক করলে সেও হাসিমুখে যোগ দিত।

ঐ পাঁচজনের আড্ডা ছাড়া আর কোথাও তাকে দেখা যেতনা।

সেখানেও যখন হাসি-পরিহাস তর্ক-বিতর্কের, বিপুল কলরব তুমুল হয়ে ওঠে, উইট-এর লড়াই-এ ওকে ঘায়েল করার চেষ্টা করে, তখন মানবের ভূমিকাটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নীরব শ্রোতার। যুৎসই জবাব ওর মুখে ফস করে যোগায় না বলেই সে বড় একটা মুখ খোলেনা।

প্রায় সব দিক দিয়ে আলাদা হয়েও যে এদের দলে সে ঢুকে পড়েছিল তার মূলে অনেকটা দীপা।

ইংরাজীর ক্লাসে দীপালী বোস ও মানব মুখার্জি দুজনেই কোন বিশিষ্ট অধ্যাপকের সস্নেহ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, এবং তাঁরই মাধ্যমে এদের আলাপ। সেটা ক্রমশঃ দীপার অন্যান্য বন্ধুদের এলাকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। বিশেষ করে তিনজন—কৃষ্ণা, শোভন আর প্রসূন।

ওরা এটা ওটা নিয়ে প্রায়ই মানবের পেছনে লাগত। তার মধ্যে প্রায়শঃ যে ইঙ্গিত থাকত সেটা হচ্ছে এই যে দীপার সম্পর্কে তার রীতিমত দুর্বলতা আছে।

কৃষ্ণার খর-রসনা এই নিয়ে মাঝে মাঝে তাকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ত, আর 'মোটেইনা' 'বাজে-কথা' এই জাতীয় প্রতিবাদ করতে গিয়ে সে বেচারার অবস্থা আরো করুণ হয়ে দাঁড়াত।

দীপা এ ব্যাপারটাকে কখনো সিরিয়াসলি নেয়নি এবং অন্য বন্ধুরাও হয়তো একে নিছক রঙ্গ-কৌতুক ছাড়া অন্য ভাবে দেখতনা। সেই সঙ্গে, যে-হেতু মানব কথা-বার্তায় ওদের মত দড় নয়, তাকে

বেকায়দায় ফেলে একটু আমোদ উপভোগ করবার হাতিয়ার হিসাবেই ব্যবহার করত।

দীপা বলল, তাহলে এখন বাড়ির দিকেই যাবে তো?

হ্যাঁ, তাছাড়া আর কী করবো?

উত্তরের সুরটা এমন, যে বাড়ি যাওয়া ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই বলেই যেন যেতে হচ্ছে। দীপার কানেও সেটা লাগল, কিন্তু চুপ করে রইল।

মানব একটুখানি ইতস্তত: করে বলল, তোমার কি খুব তাড়া আছে বাড়ি ফেরার?

ঐ তিনজনের কাছে বিদায় নেবার কারণ হিসাবে এমন একটা জরুরী প্রয়োজনই দেখিয়েছিল দীপা। এবার অন্য কথা বলল, না, তেমন আর কী তাড়া?

তাহলে একটা কথা বলব?

বলনা।

চল, কোথাও ঘুরে আসি।

কোথায় যেতে চাও?

মানব সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলনা। মাটির দিকে তাকিয়ে কী ভাবল। বোধহয় একবার ঢোঁক গিলল।

তারপর যেন অনেকখানি সাহস সঞ্চয় করে বলে ফেলল, আমাদের বাড়ি চলনা! অবিশ্যি তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে।

দীপা হঠাৎ চোখ তুলে তাকাল। তার মধ্যে কিছুটা চমক। অন্য কোথাও একটু ঘুরে আসার কথাই বলবে মানব, এইটাই ভেবেছিল, হঠাৎ ওদের বাড়ি নিয়ে যেতে চাইবে, মনে করেনি। আগে কখনো বলেনি।

একটু দ্বিধাও হয়তো উঠে থাকবে মনের কোণে। তখনই সরিয়ে দিয়ে সহজ নিরাসক্ত সুরে বলল, আপত্তি আর কী? তবে তোমাদের বাড়ির কেউ তো আমাকে চেনে না। হঠাৎ গিয়ে পড়লে—

কেউ বলতে কেউ নেই। এক ভোলাদা। সারভেণ্ট কাম কেয়ারটেকার কাম লোক্যাল গার্জেনও বলা যায়। সে যে খুব খুশী হবে সেটা জোর করে বলতে পারি।

উত্তর কোলকাতায় মানবদের একটা বাসা আছে, সেখানে থেকে পড়ে, এটা জানত দীপা। কিন্তু ও যে একা থাকে, জানা ছিল না।

প্রথমটা একটু বাধোবাধো যে ঠেকেনি তা নয়। ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে যতই আড্ডা দিক একা কারো বাড়িতে—।

তারপর নিজের মনেই হাসল দীপা। ভয়টা কিসের? তাছাড়া মানবকে সে অনেক বেশী চেনে।

॥ তিন ॥

বাগবাজারে একটা গলির মধ্যে এই ছোট বাড়িটা মানবের বাবা অনেক বছর আগে ভাড়া নিয়েছিলেন। মাত্র তিরিশ টাকায়। দোতলার উপর ছোট-বড়য় মিলিয়ে তিনখানা ঘর, একটা ঢাকা বারান্দা, ওদিকে রান্নাঘর, বাথরুম।

দেশের জমিজমা ছাড়া কোলকাতায় কিছু কাজ-কারবার ছিল। প্রায়ই আসতে হত। সেই উদ্দেশ্যেই নেওয়া। তিনি মারা গেছেন, কারবার উঠে গেল, কিন্তু বাসাটা রয়ে গেল।

মানবের মা মাঝে মাঝে এসে থাকতেন।

মাসে দু-একবার গঙ্গাস্নান এবং সেই সঙ্গে কালীঘাট দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে মাকে দর্শন—এটা ছিল তাঁর বরাবরের নিয়ম।

বাড়ির মালিক একটি প্রৌঢ়া বিধবা। জাতে সুবর্ণ বণিক, অবস্থা ভাল, কিন্তু প্রয়োজন সামান্য। ওদিকে ব্রাহ্মণ-ভক্তি প্রবল।

এদের তুলে দিয়ে কিংবা চাপ দিয়ে তিরিশকে বাড়িয়ে অনায়াসে তিনশতে তোলা যেতে পারে—এ পরামর্শ তাঁকে অনেকেই দিয়েছিল। তিনি কানে তোলেন নি।

মানবের মা-ই নিজে থেকে দু-পাঁচ টাকা করে বাড়িয়ে তিরিশকে পঞ্চাশে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন।

মানব বি, এ পাশ করার পর যখন পোষ্ট গ্রাজুয়েটে ভর্তি হল, তখন এটাই হল তার স্থায়ী আস্তানা। সঙ্গে ছিল ভোলানাথ—তার

বাবার আমলের ভৃত্য। ছেলের আমলে স্বভাবতই তার সঙ্গে আরো ছু-এক ধাপ প্রমোশন পেয়ে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই চওড়া ঢাকা বারান্দা। তার একধারে একটি গোল টেবিল ঘিরে চারখানি বেতের চেয়ার। পুরনো ধরনের কিন্তু নতুন রং করা। লোকজন এলে বসানো হয়।

মানব দীপাকে সেখানে বসাল না। বলল, ভেতরে চল।

যে ঘরে নিয়ে গেল বোঝা গেল সেটা ওর পড়বার ঘর। দেয়ালের গায়ে ছু আলমারী ভর্তি বই। একধারে চেয়ার টেবিল, একটা ইজিচেয়ার, দেয়াল ঘেঁষে একখানা তক্তপোষ, তার উপরে সতরঞ্চি আর একটা তাকিয়া। ঝাড়া পোঁছা, পরিষ্কার।

দীপা খুশী মুখে চার দিকটা তাকিয়ে দেখছিল। মানব বলল, বসো।

দীপা তক্তপোষের দিকে এগিয়ে যেতেই যোগ করল, ওখানে কেন? ইজিচেয়ারে আরাম করে বসো।

'এই বেশ।' বলে তক্তপোষেই বসল দীপা।

মানব পাখাটা চালিয়ে দিয়ে 'ভোলাদা' বলে একটা হাঁক দিল।

ভিতর থেকে সাড়া এল 'যাই।' কিন্তু কেউ আসার আগেই মানব একটু ব্যস্তভাবে বলল, আমি এখখুনি আসছি।

'শোন' পিছন থেকে বাধা দিল দীপা, 'একরাশ খাবার-টাবার আনতে পাঠিও না যেন।'

একটু চা খাবে তো?

—হ্যাঁ, তা খাবো। তার সঙ্গে ছুখানা বিসকিট হলেই চলবে।

—আচ্ছা তাই হবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল মানব। দীপা তখন উঠে গিয়ে বই-এর আলমারী ছুটো দেখছিল।

একটাতে একসেট রবীন্দ্রনাথ। তাছাড়া শরৎচন্দ্র তারাশঙ্কর এবং কিছু কিছু সাম্প্রতিক কালের অন্যান্য লেখক।

সেখানে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ইংরেজি বইগুলোই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। প্রধানতঃ সাহিত্য। ক্লাসিকস ও কিছু কিছু সাম্প্রতিক কালের প্রসিদ্ধ রচনা।

তার সঙ্গে, বিশেষভাবে যেটা ওর নজরে পড়ল, এম এ কোর্সের আটটি পেপার ভালভাবে তৈরি করতে হলে যে ব্যাপক পড়াশুনো দরকার তার সমস্ত উপকরণ সাজানো রয়েছে। অধ্যাপকেরা যে সব বই-এর নাম করে থাকেন, অথচ বেশির ভাগ ছাত্র পড়ে না তার অনেকগুলোই সংগ্রহ করা হয়েছে।

দু-একখানা টেনে বের করে পাতা উলটে দেখল, জায়গায় জায়গায় পেন্সিলের দাগ এবং কিছু কিছু মার্জিন্যাল নোট। অর্থাৎ শুধু কিনে রাখা হয়নি, ওগুলো যত্ন করে পড়া হয়ে থাকে।

মানব বলল, কী দেখছ?

তোমার লাইব্রেরী দেখে লোভ হচ্ছে। এমন ভাল কালেকশান! ইচ্ছে করছে তুলে নিয়ে যাই।

মানব হাসল, বেশ তো, যাও না। কে বাধা দিচ্ছে?

নিয়ে কি করবো? এত পড়ার আমার ধৈর্য নেই। তাছাড়া সবটা বুঝতে পারলে তো?

আমিও কি সব বুঝি? কিছু কিছু চেষ্টা করি, এই পর্যন্ত।

আমার দ্বারা তাও হয় না। লাইব্রেরী থেকে দু-এক খানা যা পাই পাতা ওলটাই। তাও আবার বেশির ভাগ দিন স্লিপ দিলে শুনতে হয় 'ইশুড'।

মানব একটু কি ভাবল। তারপর দীপার মুখের দিকে চেয়ে

বলল, আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না? বোঝার ব্যাপারটা তো আমরা ভাগাভাগি করে নিতে পারি।

'মানে?' ওর চোখে চোখ রাখল দীপা।

এক জায়গায় বসে যদি পড়া যায় কিছুটা তুমি বুঝলে, কিছুটা আমি বুঝলাম। দুজনে মিলে সবটা বোঝা হয়ে গেল।

ইঙ্গিতটা খুবই স্পষ্ট। দীপার ধরতে কিছু অসুবিধা হল না। কিন্তু ও নিয়ে আর কিছু বলল না। ফিরে এসে আগের জায়গায় বসল।

'ভোলাদা যে কী করছে!'—হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল মানব। সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে যাচ্ছিল।

দীপা বাধা দিল—অত ছটফট করছ কেন? বসো না। হয়ে গেলে নিজেই নিয়ে আসবে।'

কিছুক্ষণ পরেই এল ভোলানাথ। হাতে ট্রে-র উপর দু ডিস বেগুনী, সঙ্গে কিছু আলুর চপ, অর্থাৎ বেসনে ডুবিয়ে ভাজা আলুর চাকতি।

একটা টিপয় ছিল ঘরের কোণে। মানব সেটা দীপার সামনে এনে বসিয়ে দিল। ট্রেটা নামিয়ে রাখতে রাখতে কৈফিয়তের সুরে বলল ভোলানাথ, আপনি দাদাবাবুর সঙ্গে পড়েন। পেরথম আসছেন আমাদের বাসায়। বাজারের খাবার তো দেওয়া যায় না। দাদাবাবু বলছিল ডিম পাউরুটি এসব করতে। আমি ভাবলাম, কোলকাতার মানুষ তো দিদিমণি। একবার আমাদের খাস পাড়াগেঁয়ে খাবার একটু পরখ করে দেখুন না। খাঁটি তেল। আমাদের নিজেদের ক্ষেতের সর্ষে সামনে বসে ঘানি থেকে ভাঙিয়ে এনেছি। নির্ভয়ে খান।

'তেলেভাজা' দীপার ভীষণ প্রিয় জিনিস। (তার বয়সী কোন

মেয়েরই বা নয় ?) ঘরে তৈরি গরম গরম বেগুনী আর চপগুলোর দিকে তাকিয়ে তার দু চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তখনই একটা তুলে নিয়ে কামড় দিয়ে বলল, 'চমৎকার'!

মানব বলল, এসব ভোলাদার পাগলামি। আমার কিন্তু ভয় ছিল, এগুলো তুমি পছন্দ করবে না।

পছন্দ করবো না মানে ? এর চেয়ে লোভনীয় খাবার আর কিছু আছে নাকি ?

মুখে তোলা যাচ্ছে তো দিদিমণি ? ভোলানাথ জানতে চাইল।

তুমি ছাখো না ? আমি সবগুলো খেয়ে নিচ্ছি। কই, আপনি খাচ্ছেন না যে বড় ?

এই তো খাচ্ছি।···বলে মানবও তুলে নিল একটা।

চা-টা কিন্তু আমি ভালো করতে পারব না দিদিমণি। আমরা পাড়াগেঁয়ে মানুষ।

বেশ তো। তুমি জলটা ফুটিয়ে সরঞ্জামগুলো নিয়ে এসো। আমি করে নিচ্ছি।

শোভন প্রসূন-কৃষ্ণা আগের মতই লাইব্রেরীতে এসে অপেক্ষা করে। কিন্তু বেশীর ভাগ দিন দীপা মানবকে পাওয়া যায় না। একদিন ইউনিভার্সিটি করিডোরে দীপাকে চেপে ধরল কৃষ্ণা—কী ব্যাপার বলতো ?

দীপা অম্লান মুখে বলে ফেলল, কী জানিস ? বাবা একজন টিউটর ঠিক করে ফেলেছেন। সন্ধ্যা হতে না হতেই এসে পড়েন ভদ্রলোক।

আর মানব আসে না কেন ? তারও কি টিউটর ঠিক হয়েছে নাকি ?

তা তো জানি না।

ছ্যাখ, আমরা কিন্তু অন্য কিছু ভাবছি।

অন্য কিছু মানে?

তোমরা ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ।

জল যদি খেতেই হয়, ডুবে ডুবে খাবো কেন? প্রকাশ্যে সবার সামনেই খাবো।

আমিও তাই বলি। সে রকম যদি কিছু হয় আমাকে অন্তত বলিস।

আচ্ছা, আচ্ছা। তবে জেনে রাখ, যা ভাবছিস সবই তোদের উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা।

সপ্তাহে দু-তিন দিন বিকেলগুলো ওদের কাটছিল বাগবাজারে মানবের পড়বার ঘরে।

কখনো কখনো বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে যেত। উদ্দেশ্য-দুজনে মিলে আলোচনা করে করে পড়া।

প্রথম দিন মানবের প্রস্তাবে দীপা হাঁ না কিছু বলেনি। তারপর ঘটনাচক্রে ওদের সেই অধ্যাপকের মাধ্যমে এর শুরু।

দীপা সেদিন কোন কারণে ক্লাসে যায় নি। তিনি কিছু নোট দিয়েছিলেন যা বিশেষ দরকারী। পরে দীপার সঙ্গে দেখা হতে বলেছিলেন, ওটা মানবের কাছ থেকে নিয়ে নিও। ঐ সূত্রে যে রেফারেন্স বই-এর উল্লেখ করেছিলেন সেটাও মানবের লাইব্রেরীতে ছিল।

পড়াশুনোর ফাঁকে ফাঁকে অন্যান্য কথাও হত। প্রধানতঃ এম. এ. পাশ করার পর কার কী করার ইচ্ছা। দীপা মনে করে রেখেছিল রিসার্চের দিকে যাবে, যদি অবশ্য রেজাল্ট তেমন ভাল করতে পারে। শুরুতে মানবের মনোগত অভিপ্রায়ও ছিল তাই। পরে বুঝেছিল তাতে বাধা আছে।

দেশের জমিজমার আয় থেকেই ওদের সংসার চলত। সিলিং আইন হবার পর তার পরিমাণ যা দাঁড়িয়েছিল, আগের মত বর্গাদারের দেওয়া আদ্ধেক ভাগ থেকে সব কিছু বজায় রাখা ক্রমশঃ কঠিন হয়ে পড়ছিল। চাষবাস নিজেদের হাতে নিয়ে নেওয়া অর্থাৎ লোকজন রেখে চালানো ছাড়া অন্য পথ ছিল না। তার জন্যে দেখাশুনো দরকার।

মানব বাড়ির বড় ছেলে। উপরে নীচে দুই বোন। তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। আর একটি খুড়তুতো ভাই। কলেজে পড়ে। কাজেই মানব ভেবে রেখেছিল স্থানীয় কলেজে একটা লেকচারারশিপ যদি পাওয়া যায় বাকী সময়টা ক্ষেতখামার দেখাশুনো নিয়ে কাটাবে।

প্রিন্সিপ্যাল সে আশ্বাসও দিয়ে রেখেছিলেন। অনেক বছরের মধ্যে তাঁর কলেজ থেকে এরকম ভাল ছেলে বেরোয় নি।

তাছাড়া এ যুগে চাষবাস যে শুধু চাষাভুষোর কাজ নয়, বরং তার রীতিনীতি, সুযোগসুবিধা যে রকম বদলে যাচ্ছে লেখাপড়া জানা ভদ্রঘরের ছেলেদেরই সেটা হাতে নেওয়া দরকার, মানব সেটা বুঝেছিল এবং এদিকে তার একটা স্বাভাবিক ঝোঁকও ছিল।

একদিন কথায় কথায় বলছিল মানব, তোমরা হয়তো এখনো টের পাওনি গ্রামগুলো আর আগের মত নেই।

দীপার গ্রাম সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না। বলল, আগের মত মানে?

মানে সেই যে বইতে পড়েছ, একহাত পুরু পাঁকে গোরুর গাড়ির চাকা বসে গেল আর উঠল না। সন্ধ্যা না হতেই চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। পানাপুকুরের পচা জল, জোঁক, সাপ, ম্যালেরিয়া—সেসব আর পাবে না। পাকা রাস্তা, ইলেকট্রিক লাইট, টিউবওয়েল

বাস—এই শহুরে সুবিধেগুলো আমরাও পাচ্ছি। আমাদের বাড়িতে মা আবার পাম্প আর ওভারহেড ট্যাঙ্ক বসিয়ে ট্যাপওয়াটারের ব্যবস্থাও করে নিয়েছেন।

ট্যাপওয়াটার পাড়াগাঁয়ে! বড় বড় চোখ করে তাকাল দীপা, 'বল কী!'

হ্যাঁ; কল খুললেই জল। বাথরুমে শাওয়ার, যা এ বাড়িতে নেই।

মানবদের দেশের খবর গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনত দীপা।

তাদের ভবানীপুরের বাড়ির মোটামুটি অবস্থাটাও অমনি কথায় কথায় মানবের জানা হয়ে গিয়েছিল।

একদিন দীপা এসেছে মানবদের বাসায়। সে কোথায় বেরিয়েছে। হয়তো এখনই এসে পড়বে।

পড়ার ঘরে মানবের মুখোমুখি যে চেয়ারটায় সে বসে, সেখানেই অপেক্ষা করছিল। একটি বর্ষিয়সী মহিলা ঘরে ঢুকলেন। পরনে সাদা থান, সেমিজ, প্রায় পেকে যাওয়া চুল, ফর্সা রং, মুখখানা একটু শীর্ণ কিন্তু বেশ একটা স্নিগ্ধ শ্রী আছে চোখে চিবুকে গণ্ডে।

এগিয়ে এসে বললেন, আমি মানবের মা। তুমি দীপা তো?

হ্যাঁ, বলে দীপা উঠে গিয়ে প্রণাম করল।

উনি ওর চিবুকে হাত দিয়ে আঙুলকটি ওষ্ঠে ঠেকিয়ে বললেন, এখানে কেন মা? এসো, ভেতরে এসো। আমি তোমার কথা শুনেছি মান্নুর কাছে।

পাশের ঘরটিতে মানব থাকে। দীপা জানত, কিন্তু কখনও ঢোকেনি। এই প্রথম দেখল।

পড়ার ঘরের চেয়ে বেশ বড়। পুরনো ধরনের খাট, ড্রেসিং টেবিল, আলনা। দেয়ালে কিছু পারিবারিক ছবি। লাল সিমেন্টের

মেঝে তকতক করছে। সাদা পরিষ্কার দেয়াল। সব মিলিয়ে পরিবেশটি বেশ পরিচ্ছন্ন।

'এটা মানুর ঘর' বলে মানবের মা দীপাকে নিয়ে গেলেন পাশের ঘরে।

একধারে একখানা তক্তপোষের উপর ধবধবে বিছানা। মেঝেতে একটি মাদুর পাতা! দেয়ালে দেবদেবীর ছবি। একপাশে একটি আলমারী, দেয়াল আলনায় সামান্য কিছু কাপড় চোপড়। এছাড়া আর কোন আসবাব নেই।

আমি যখন আসি,—এই ঘরে থাকি। তুমি কোথায় বসবে? দাঁড়াও একটা চেয়ার টেয়ার—ভোলা……

চেয়ার কী হবে? আমি মেঝেতে বসছি।

মাদুরের উপর বসে পড়তে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল দীপা, 'আপনি ওখানে বসুন'—বলে খাটটা দেখিয়ে দিল।

না, না; আমিও তোমার পাশে বসছি।

তারপর দীপাদের বাড়ির খোঁজখবর নিলেন মানবের মা। কটি ভাইবোন, বাবা কী করেন, দাদা কেমন আছে চিঠি পত্র পেয়েছ কিনা, আত্মীয়-স্বজন কি সবই কোলকাতায়? ইত্যাদি।

শেষ প্রশ্নের উত্তরে দীপা জানাল, তার মামাবাড়ি চুঁচড়োয়। তবে সেখানে বিশেষ কেউ নেই, অন্য আত্মীয়রা কোলকাতার নানা জায়গায় থাকেন।

দীপাকে কিছু মিষ্টিমুখ না করিয়ে ছাড়লেন না। সে আপত্তি করল, বাড়ি থেকে চা-টা খেয়ে বেরিয়েছি।

(তাই এসেছিল। সেদিন ইউনিভার্সিটি ছিল না।)

তাহলেও দুটো তো মিষ্টি। বাগবাজারের নবীন ময়রার রসগোল্লা, বেশ নাম আছে। আমার কিন্তু ভাল লাগে না। পঞ্চ

না কী বলে। কেমন যেন ছিবড়ে ছিবড়ে। তোমার কেমন লাগে ?

ভালোই তো। মৃদু হাসল দীপা।

তোমাদের ওদিকেও আছে বুঝি ওর দোকান ?

না ; এখানেই খেয়েছি—

বলতে গিয়ে অকারণেই মুখে একটু লালচে আভা দেখা দিল। মহিলাটি হয়তো লক্ষ্য করলেন।

মানব ফিরে এসেছিল। এদিকে আসেনি, পড়বার ঘরেই অপেক্ষা করছিল।

আরো কিছুক্ষণ গল্প করবার পর তার মা-ই জানিয়ে দিলেন মানু এসেছে। তোমরা তো এখন পড়াশুনো করবে ?

উত্তরে দীপা শুধু একটু হাসল। তিনি বললেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো মা ? তোমরা আজকালকার মেয়ে ; এম. এ পড়ছ। বলতে লজ্জা কী ? বাবা-মা তোমার বিয়ে-থার চেষ্টা করছেন না ?

বোধহয় না। সামনেই পরীক্ষা।

ও, তাই তো।

॥ চার ॥

বাগবাজারে আসাযাওয়াটা গোড়াতে গোপনই ছিল। শুধু বন্ধুদের কাছে নয়, দীপা বাড়িতেও জানায়নি। যেদিন ফিরতে দেরি হত প্রমীলা মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেন মেয়ের মুখের পানে।

একদিন বললেন, তোদের লাইব্রেরী তো সন্ধ্যার আগেই বন্ধ হয়ে যায়।

হ্যাঁ।

তাহলে এতক্ষণ থাকিস কোথায়?

দীপা নীরব।

প্রমীলা এবার বেশ বিরক্তির সুরে বললেন, কমাস পরে পরীক্ষা। এখন এত কিসের আড্ডা? এখন থেকে ভালমত পড়াশুনো না করলে পাশ করবি কেমন করে? উনি একজন মাস্টার রাখার কথা বলছিলেন। তাও রাজী হলি না; এদিকে নিজেরও তেমন চেষ্টা নেই। তোর মতলবটা কী বল দিকিন?

পড়াশুনো ঠিকই হচ্ছে।

কোথায় হচ্ছে! বাড়ি ফিরতেই তো আটটা বেজে যায় কোন কোনদিন।

ক্লাসের পর একজন বন্ধুর বাড়িতে একসঙ্গে বসে পড়ি। কোনো মাস্টারের চেয়ে সে কম নয়।

ওদের ঐ পাঁচ বন্ধুর দলটিকে প্রমীলা মোটামুটি জানতেন। বললেন, কে সে? কৃষ্ণা?

না, কৃষ্ণার তো অন্য সাবজেক্ট।

তবে?

মানব।

প্রমীলার ভ্রুকুঞ্চিত হল। এখনকার ছেলেমেয়েরা নিজেদের মধ্যে মেলামেশা করে, দল বেঁধে হোটেলটোটেলে খায়দায়, এখানে ওখানে বেড়াতে যায়, সেটা তিনি মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু সন্ধ্যার পর মেয়ে একা একটি ছেলের বাড়িতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে আসে, এতখানির জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না।

অবশ্য মেয়েকে তিনি চেনেন, তার উপর যথেষ্ট বিশ্বাসও রাখেন। তবে দুজনের বয়সটা দেখতে হবে তো? না, জিনিসটা মোটেই ভাল হচ্ছে না। কিন্তু কী বলা যায় তাও সহসা ভেবে পেলেন না।

দীপা মায়ের মনের কথাটা বুঝল।

কিছুদিন থেকেই ভাবছিল, মাকে ব্যাপারটা জানিয়ে দেবে। দোষের তো কিছু নয়। কিন্তু বলব বলব করে বলা হয়নি।

প্রমীলা সেই কথাই পাড়লেন, এতদিন বলিস নি তো?

বলবার তেমন কোন উপলক্ষ হয়নি, তাই। মানব কে, তা তো তুমি জান।

কোথায় থাকে ওরা?

বাগবাজারে।

ঐখানেই বাড়ি?

না, বাড়ি বীরভূম জেলার একটা গ্রামে। এখানে বাসা।

মা-বাবার সঙ্গে থাকে?

বাবা নেই, মা আছেন। তিনি মাঝে মাঝে আসেন। ও একজন চাকর নিয়ে থাকে।

এরপর প্রমীলার মুখে আর কোন কথা যোগাল না। একেবারে চুপ করে গেলেন।

কিন্তু সেদিন থেকেই উঠতে বসতে ব্যাপারটা তাঁর মনের মধ্যে খচখচ করে বিঁধতে লাগল।

স্বামীকে কিছু বলা যায় না। যেরকম রগচটা মানুষ, একেবারে 'কুরুক্ষেত্তর বাধিয়ে' বসবেন হয়তো। তিনি এটা কিছুতেই সমর্থন করবেন না। মনে মনে প্রমীলাও কি করছেন?

অথচ কিছু বলতে যাওয়াও বিপদ। মেয়ে মনে করবে মা তাকে সন্দেহ করছে। যা জেদী স্বভাব, তারপর কী করে বসবে কে জানে?

আসলে মেয়েকে তিনি রীতিমত ভয় করে চলেন।

একদিন খেতে বসে একথা সেকথার মধ্যে হঠাৎ দুম করে জিজ্ঞাসা করে বসলেন হ্যাঁরে, মানবের পুরো নাম কী?

দীপা খাচ্ছিল। একটু অবাক হয়ে মাথা তুলে তাকাল। তারপর সহজ সুরেই বলল, মানব মুখার্জি।

ওরা তাহলে বামুন।

মার কথায় যেন একটা প্রচ্ছন্ন হতাশার সুর লক্ষ্য করল দীপা। হেসে বলল, কেন, তুমি কি অন্য কিছু ভেবেছিলে?

না, তা নয়।, মৃদু শুষ্ক স্বরে বললেন, প্রমীলা।

তারপর নীরবে খেয়ে উঠে গেলেন।

পরীক্ষা যখন আরো কাছে এসে গেল, প্রমীলা লক্ষ্য করলেন, দীপা কলেজ থেকে সোজা বাড়ি চলে আসে এবং সন্ধ্যা হলেই নিজের ঘরে পড়তে বসে যায়।

মানবদের বাড়িতে আর যাচ্ছে না দেখে ঐ নিয়ে যে দুশ্চিন্তা

ছিল সেটা অনেকখানি কেটে গেল। সেই সঙ্গে একটা অস্বস্তি এসে জুটল। কী হল ওদের? মার ইচ্ছা নেই, তাই রাগ করে যাওয়াআসা বন্ধ করে দিল?

একদিন দীপা যখন পড়ছিল ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন, আজকাল ওখানে যাস না কেন?

'আর দরকার নেই।'

মুখ না তুলেই কী একটা লিখতে লিখতে উত্তর দিল দীপা।

কেন দরকার নেই কেন? বেশ তো একসঙ্গে বসে পড়ছিলি।

দীপা এবার বুঝিয়ে দিল, কতগুলো জিনিস আছে, একসঙ্গে আলোচনা করে পড়লে সুবিধে হয়। এতদিন আমরা তাই করছিলাম। সে সব হয়ে গেছে। এখন নিজে নিজে তৈরী করার পালা। তুমি যাও তো। আমার অনেক কাজ আছে।

প্রমীলা চলে গেলেন, কিন্তু মনের কোণে কোথায় যেন একটু মেঘ লেগে রইল।

পরীক্ষা মিটে যাবার পর একদিন বাবার ঘরে ডাক পড়ল দীপার।

মন্দ নয়। একটা পেপার একটু খারাপ হয়েছে।

লিখেছিস তো সব? কোনো কোশ্চেন বাদ যায়নি?

না, বাদ যায়নি, তবে গোটা দুই কোশ্চেন খুব ভালো তৈরী ছিল না। মোটামুটি লিখে এসেছি।

তা হোক। ফার্স্ট ক্লাস না পেলেও হাই সেকেণ্ড ক্লাস থাকবে আশা করি। তা হলেই হল। তোমাকে তো আর চাকরি করতে

হবে না।…হ্যাঁ, অতীশের মার ইচ্ছা শুভ কাজ তাড়াতাড়ি হয়ে যাক। এখন তো আর কোন বাধা নেই। আমরাও তৈরী।

দীপা মাথা নীচু করে বসে রইল। হ্যাঁ না কিছু বলল না। প্রাণতোষের মেজাজটা সেদিন কোন কারণে বেশ ভাল ছিল। মেয়ের আনত মুখের দিকে চেয়ে মনে মনে হাসলেন। যতগুলো পাশই করুক, আর যতই বলিয়ে কইয়ে হোক, নিজের বিয়ের ব্যাপারে কোন মেয়েই মুখ ফুটে কিছু বলে না। খুশী মনেই নিলেন প্রাণতোষ।

বললেন, আচ্ছা তুই ভেতরে যা।

দীপা ভিতরে গিয়েই মাকে জানিয়ে দিল, বাবাকে বলে দিও, রেজাল্ট বেরোবার আগে বিয়ে থা সম্বন্ধে আমি কিছুই ভাবছি না।

প্রমীলা কৌতূহলী হলেন, কেন কিছু বলছিলেন নাকি?

হ্যাঁ, ওদের নাকি আর তর সইছে না।

না, না; তেমন কিছু তো শুনিনি। উনি ওরকম বলে থাকেন। অতীশের মা এসেছিলেন সেদিন। কথাটা আবার নতুন করে তুললেন। ও'রা তো বরাবরই তৈরী। আমরাই পিছিয়ে দিয়েছিলাম পরীক্ষা টরীক্ষার জন্যে। তা, সে সব তো চুকে গেছে। এখন তাহলে—

না; ওঁরা তৈরী হলেও আমি তৈরী নই।

বলেই চলে যাচ্ছিল। প্রমীলা ডেকে ফেরালেন, যাচ্ছিস কোথায়? শোন।

কী?

প্রমীলা কাছে সরে এসে এদিক-ওদিক চেয়ে চাপা গলায় বললেন, অতীশকে কি তোর পছন্দ নয়?

মেয়ে গুম হয়ে আছে দেখে যোগ করলেন, ছেলেটা তো বেশ

ভাল-দেখতে শুনতে, কথায়বার্তায়। তার ওপরে রোজগার টোজগার মন্দ নয়। ক্রমে আরো।

তবে আর কী? আমার চেয়ে অনেক ভাল ভাল মেয়ে জুটে যাবে। আমাকে রেহাই দিতে বলে দাও না।

মাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

বিনা কারণেই অতীশের উপর মনটা আরো বিরূপ হয়ে গেল। সন্দেহ হল, সেই পিছনে বসে কলকাঠি নাড়ছে। গরজটা মার নয়, ছেলের। ভালো রোজগারকে শ্বশুরের সাহায্যে আরো ভালোর দিকে নিয়ে যাওয়াই আসল উদ্দেশ্য। সেই জন্যই এই তাড়াহুড়ো।

তার কোন লক্ষণ বা প্রমাণ যে দীপার চোখে পড়ছে বা কানে এসেছে তা নয়। তবু সন্দেহ সন্দেহ। অনেক সময়ে ওটা মনের মধ্যে আপনা থেকে জন্মায়।

অতীশের কথা যখন ভাবছে, মনের অন্য প্রান্তে আরেকখানা মুখ হঠাৎ ভেসে উঠল। কেন, কোন সূত্র ধরে এল দীপা জানে না। শুধু যে এল তা নয়, রয়ে গেল। ধীরে ধীরে যেন সারা মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

কেমন ধারা মানুষ! পরীক্ষার শেষ দিন হল থেকে বেরিয়ে দেখা। দু চারটে কথা। কেমন হল তাই নিয়ে প্রশ্ন, পালটা প্রশ্ন। সেই শেষ। বলে গেল, কাল বাড়ি যাচ্ছি। ব্যাস্। তার পরে আর কোনো পাত্তা নেই!

এখানে যদি থাকত, দীপা না হয় নিজে গিয়ে একদিন খোঁজ নিতে পারত। এল কিনা তাই বা কে জানে? একটা চিঠি কিংবা কোনো জায়গা থেকে একটা ফোন—এমন কি কঠিন ব্যাপার?

আসলে এ এক বিচিত্র ছেলে। এতদিন ধরে এত মেলামেশার পরেও ঠিক চেনা গেল না। বোঝা গেল না, কী আছে ওর মনের তলায়।

বেশির ভাগ ছেলের মত হালকা নয়, প্রগলভ নয়, অনেকখানি গভীর, সেটা না হয় মেনে নেওয়া গেল। তবু আভাসে, ইঙ্গিতে কিছু একটা বলবে তো?

ওদের সেই পুরনো আড্ডা আগেই ভেঙে গিয়েছিল। পরীক্ষার পর কে কোথায় ছিটকে পড়েছে। যেমন হয়।

একদিন হঠাৎ কৃষ্ণার সঙ্গে রাস্তায় দেখা। সে কিছু কিছু জানত। তার উপরে মেয়ে তো! এসব ব্যাপারে একটা বাড়তি চোখ থাকে। সামান্য কিছু পেলেও সেখানেই থেমে যায় না। আরো গভীরে দৃষ্টি দিতে জানে। দেখেই কলকণ্ঠে বলে উঠল, তোদের খবর কী?

তোদের মানে?

কেন ভণ্ডামি করছিস? আমি বুঝি কিছু জানি না?

কী আর খবর? নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল দীপা।

সে কীরে? আমি মনে করেছি অনেকটা এগিয়ে গেছিস তোরা। এবার একদিন ছম করে একখানা রঙিন কার্ড এসে যাবে।

তুইও যেমন।

চল; ঐ পার্কটার ভিতরে গিয়ে বসি।

ঘাসের উপর মুখোমুখি বসল দুজনে।

চিনাবাদামওয়ালা এল। ছোট একটা ঠোঙা কিনে নিজে গোটা কয়েক তুলে নিয়ে, কয়েকটা দীপার হাতে দিয়ে খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে দু চারটা অন্তরঙ্গ প্রশ্ন করল কৃষ্ণা।

তার মুখে কিছুই বাধে না। দীপার মুখ লাল হয়ে উঠল। কখনো ঘাড় নাড়ল। কখনো বলল, যাঃ!

কৃষ্ণা বলল, নাঃ, তুই একেবারে হোপলেস্। হতাম আমি?

যা না? কে মানা করছে?

ঈস, প্রাণ ধরে ছেড়ে দিতে পারবি? বুক ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

—মোটেই না।

আরো কিছুটা জিজ্ঞাসাবাদের পর কৃষ্ণা হেসে উঠল, এই মরেছে! ঐ মুখ চোরা 'গাঁইয়া'টা মুখ ফুটে কিছু বলবে এই আশা করে বসে আছিস? কেন, ওর নজর টজরগুলো দেখিসনি? মেয়েমানুষ হয়েছিস কী করতে?

কি জানি? আমি অত বুঝিটুঝি না।

সেই দিনই বাড়ি ফিরে মানবের চিঠি পেল দীপা। খামেভরা কয়েকটি মাত্র লাইন। বাগবাজারের বাসা থেকে লেখা—'কাল সন্ধ্যার গাড়িতে ফিরলাম'। মাও এসেছেন। তিন চার দিন থাকবেন। এর মধ্যে যদি একবার ঘুরে যেতে পার, খুব ভাল হয়। মাও আসতে বলছেন।

এই শেষ তিনটি শব্দের মধ্যে যেন কিছুটা ইঙ্গিত ছিল। দীপার মনে পড়ল তাঁর সঙ্গে প্রথম যেদিন দেখা সেদিন পরীক্ষার ওজর দিয়েছিল। আজ হয়তো আরো কিছুটা এগিয়ে যাবেন। সোজাসুজি জানতে চাইবেন এবং তাকেও সেইভাবেই জবাব দিতে হবে।

একটা দিন সময় নিল, নিজেকে মনে মনে তৈরি করতে। তারপর দিন বিকেলে গিয়ে দেখল, মানব নেই। কে জানে হয়তো ইচ্ছা করেই বেরিয়েছে, ও আসবে অনুমান করে।

সুভাষিণী দেবী সেদিনের মতই আদর করে ওকে নিজের ঘরে নিয়ে বসালেন।

দু চারটা কুশল প্রশ্ন, সময়োচিত সাধারণ কথা। তারপর বললেন, "আমার উচিত ছিল তোমাদের বাড়ি গিয়ে তোমার মার সঙ্গে দেখা করা, এবং কথাটা পাড়া। ভাবলাম, তার আগে তোমাকে একটু জিজ্ঞেস করে নেওয়া ভাল।

একটুখানি কি ভেবে নিয়ে যোগ করলেন, গোড়াতেই একটা সামাজিক বাধা আছে তো। অবিশ্যি আমি সেটা মানি না। কিন্তু তোমার বাবা-মার মতামত তো জানি না। তাছাড়া তুমি আজকালকার মেয়ে, লেখাপড়া শিখেছ। তোমার নিজের মনটাও সকলের আগে জানতে হবে। তাই মানুকে বললাম, দীপাকে একবার আসতে লিখে দে। সেই কবে দেখেছি। আরেকবার, তোমার মুখখানা দেখতে ইচ্ছে হল।

একটু হেসে বললেন, মানুর দিক থেকে সব জেনেছি। আর আমরা, মানে আমি আর ওর কাকী কী যে সুখী হবো মা! সে তো এরই মধ্যে দিনক্ষণ দেখতে শুরু করেছে।

আমি বললাম, "দাঁড়া, অত বড় ঘরের মেয়ে, একবার জেনে নিই আমাদের এই পাড়াগাঁয়ে গরিবের সংসারে আসতে রাজী কিনা।"

দীপা নীরব।

তার আনত মুখের পানে তাকালেন সুভাষিণী। সেখানে যে একটি ঈষৎ হাসির রক্তিমাভা ফুটে, উঠেছিল তার থেকেই বোধহয় সব কিছু পেয়ে গেলেন।

খুশী মুখে বললেন, তাহলে এবার তোমার মার কাছে যেতে পারি?

এতক্ষণে মুখ তুলল দীপা—আমার মনে হয় এখনই তার দরকার নেই।

তার আগে তুমি ওঁদের সঙ্গে কথা বলে নিতে চাও?

দীপা মাথা নাড়ল।

সুভাষিণী বললেন, সেটাই ভাল। আলাদা জাত বলে যদি ওঁদের আপত্তি না হয়, আর আমার ছেলেটিকে পছন্দ করেন, আর কিছুতে আটকাবে না, এটা তুমি বলতে পার।

এদিনও মিষ্টিমুখ না করিয়ে ছাড়লেন না। তারপর সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বললেন।

"তুমি নিজে আসতে না পার কাউকে দিয়ে কিংবা একটা চিঠি লিখে খবর দিলেই আমি পানুকে সঙ্গে করে চলে যাব। পানুকে তো তুমি দেখেছ। আমার দেওর-পো।"

দীপা যখন এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল মানব তখনও ফেরেনি। ইচ্ছা করেই গা ঢাকা দিয়ে আছে। দীপা মনে মনে হাসল। কী বীরপুরুষ! মার ওপর সব চাপিয়ে দিয়ে—।

একটু মায়াও হল। বেচারা! এতদিন এত কাছে পেয়েও ছোট্ট কথাটা বলতে পারেনি।

তাছাড়া নিজের দিকটাই তো শুধু ভাবেনি। জানে, এ তরফে অনেক বাধা। শুধু আলাদা জাত নয়, অতবড় অ্যাডভোকেট প্রাণতোষ বোস তার একমাত্র বিদুষী সুন্দরী মেয়ের জন্যে অনেক উঁচু মহলের দিকে তাকিয়ে আছেন। একটা আই এ-স. বিলাত ফেরৎ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়র বা কোম্পানী একসিকিউটিভ সহজেই জুটে যাবে। সে ক্ষেত্রে কিছু বলা মানে দীপাকে বিব্রত করা।

এইসব ভেবেই হয়তো কথাটা ঠোঁটের ডগায় এনেও বের করেনি। আবার থাকতেও পারেনি। শেষ পর্যন্ত মা।

মা-ছেলের সম্পর্ক যে কত নিবিড় দীপা ভাল করেই জানে।

কিন্তু তিনি যদি এই প্রস্তাব নিয়ে দীপার মার কাছে গিয়ে হাজির হন, প্রমীলা হয়তো সরাসরি 'না' করবেন না, কর্তার ওজর দেবেন। সে বড় কঠিন ঠাঁই। জানে বলেই দীপা ওঁকে যেতে দিল না।

তারপর? নিজেই বা কী ভাবে তুলবে ব্যাপারটা? ঐ এক কথাই বলবেন "তোর বাবা কী বলেন শুনি।"

অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত দীপাকেই গিয়ে দাঁড়াতে হবে বাবার মুখোমুখি। শুধু দাঁড়ানো নয়, যাকে বলে কনফ্রনটেশন। কে জানে কী অভিযোগ উঠবে তার বিরুদ্ধে হয় তো কিছু অপ্রীতিকর প্রশ্ন। দীপাকে তার জবাব দিতে হবে।

সেটা এড়াবার জন্যেই দীপা সোজা গিয়ে উঠল বালিগঞ্জে কৃষ্ণাদের বাড়ি। মা-বাবা দুজনেই চেনেন তাকে। সে-ই গিয়ে আলাপ সালাপ করে এসেছে কয়েকবার।

কৃষ্ণা সব শুনল। তার প্ল্যানটা একটু বোধ হয় ভেবে নিল। তারপর বলল, ঠিক আছে। কিন্তু তোর হয়ে যে মামলা লড়ব, অতবড় বাঘা উকিলের সঙ্গে, ফী দিবি তো?

দেব বৈ কি?

দীপা ওর হাতে একটা চিমটি কেটে বলল, জিততে পারলে আরও পাবি।

উঃ, বলে হাত টেনে নিল কৃষ্ণা—"আচ্ছা সে পরে দেখা যাবে; মনের মত ফী কি করে আদায় করতে হয় আমি জানি।"

তখনই ঠিক হল কাল পাঁচটা নাগাদ দীপা আসবে কৃষ্ণাদের বাড়ি আর কৃষ্ণা বেরোবে তার অভিযানে। যতক্ষণ না ফেরে দীপা এখানেই অপেক্ষা করবে।

চা-মিষ্টি খেয়ে দীপা যখন উঠছে তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে দিতে কৃষ্ণা বলল, ধর, যদি হেরে যাই তাহলে তো মৃগেন বিশ্বাস ছাড়া গতি নেই।

সে আবার কে ?

ম্যারেজ রেজিস্ট্রার। আমাদের পাড়ায় থাকে। তাতে তোর শাশুড়ী, থুড়ি হবু শাশুড়ী রাজী আছেন তো ?

সেটা কি আগেই জিজ্ঞেস করা যায় নাকি ?

ও, তাও তো বটে। আর সে প্রশ্ন এখন উঠছে না। লেট আস হোপ ফর দা বেষ্ট। রাত হয়ে গেছে। তা না হলে তোকে নীরবালার সেই গানটা একবার গাইতে বলতাম—জয় যাত্রায় যাও গো, ওঠো ওঠো জয়রথে তব—

দীপার মুখে একটি ম্লান হাসি দেখা দিল, এখন গান গাইবার অবস্থাই বটে।

পরদিন।

যতটা সময় লাগবে ভেবেছিল ওরা, তার বেশ কিছুটা আগেই ফিরে এল কৃষ্ণা। দীপার চোখে মুখে সাগ্রহ প্রতীক্ষা।

সেদিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল কৃষ্ণা—'হল না। মাসিমার কোন আপত্তি নেই। বললেন, এরকম বিয়ে তো কত হচ্ছে আজকাল। তাছাড়া ওরা উঁচু জাত।

ঐ পয়েন্টে মেসোমশাইও খুব জোর দিলেন না, যদিও বললেন, আমাদের আত্মীয়-কুটুম্বেরা সবাই একে ভালভাবে নেবে না। তাঁর আসল অমত হল পাত্র সম্পর্কে। আমি বোঝাতে চাইলাম, খুব ব্রিলিয়্যাণ্ট ছেলে। নির্ঘাৎ ফার্স্ট ক্লাস পাবে। উনি হাসলেন,—তা না হয় পেল তারপর ?

মফস্বল কলেজে একটা দুশো-আড়াইশো টাকার মাস্টারি — এই তো? আমি বোঝাতে চাইলাম বাড়ির অবস্থা ভাল। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর—ভালো মানে পাড়াগেঁয়ে গেরস্ত। কিছু ধান টান পায়। এটা কি একটা জীবন? বিশেষ করে দীপার মত মেয়ের পক্ষে। যেভাবে সে মানুষ—।

কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে কি ভাবলেন। তারপর বললেন, যাক তবু মেয়ে বড় হয়েছে লেখাপড়া শিখেছে, আমি বাধা দেবো না। নিজের ভাল মন্দ সে নিজেই ভাল বুঝবে। আই ওণ্ট স্ট্যাণ্ড ইন হার ওয়ে।

তবে আমি সম্প্রদান টম্প্রদান করব না। এখানে কোন অনুষ্ঠানও হবে না। অন্য যেখানে যেভাবে হয় হোক। তার জন্যে খরচপত্তর যা লাগে আমি দেবো।

দীপা চুপ করে শুনছিল। এটা তার কাছে এমন কিছু অপ্রত্যাশিত নয়। বাবার দিকটা বুঝল সে।

মেয়ের জন্যে এতদিন ধরে যে ভবিষ্যৎ মনে মনে গড়ে তুলেছিলেন, সব ভেঙে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তিনিও যে ভেঙে পড়বেন তাতে আর আশ্চর্য কি?

কৃষ্ণা বলল, যখন চলে আসছি, ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, আমাকে ভুল বুঝো না কৃষ্ণা। আর দীপাকেও বলো, এই বিয়েতে আমি মত দিতে বা এর সঙ্গে যোগ রাখতে পারছি না, তার তার মানে এ নয়, যে তাকে আমি ত্যাগ করছি। এ বাড়িতে সে যেমন ছিল তেমনি থাকবে, যখন খুশি আসবে যাবে। আমি ওকে, আর—কি নাম যেন ছেলেটির?

বললাম, মানব।

হ্যাঁ তাকেও আশীর্বাদ করছি, যদিও সে ব্রাহ্মণ সন্তান। ওরা সুখী হোক।

দীপার চোখ দুটো ছল ছল করে উঠল।

কৃষ্ণা এবার ব্যাপারটাকে হালকা করতে চাইল, বাব্বা, কী ভয় যে হয়েছিল। অতবড় উকিল। কত না জেরার মুখে পড়তে হবে। একেবারে সহজে ছাড়েন নি। তবে আমি মোটেই ঘাবড়াই নি। ঠিক উৎরে গিয়েছি। মনে করেছিলাম তারিখ পড়বে। এক সিটিং-এ কি এতবড় মোকদ্দমার ফয়সালা হয়? হয় তো বলবেন, ভেবে দেখি। কিন্তু ভারী স্ট্রেইটফরওয়ার্ড লোক। অন্য সব উকিলের মত কেসটা ঝুলিয়ে না রেখে আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমাকে বিদায় করে দিলেন।

যাক এবার নেকস্‌ট্ স্টেপ। বাগবাজারের ঠিকানা কী বল।

ভদ্রমহিলা আছেন তো ক' দিন?

দীপা বলল, আছেন।

॥ পাঁচ ॥

পরীক্ষার ফল বেরোলে দেখা গেল মানব ফার্স্ট ক্লাসই পেয়েছে। দীপা সেকেণ্ড ক্লাসের উপরের দিকে। বোঝা গেল ঐ দুটো পেপার হঠাৎ একটু খারাপ না হলে সেও আর কটা ধাপ উঠতে পারত।

পারেনি বলে তার কোন ক্ষোভ ছিল না। এতটাও সে আশা করেনি। মানব যখন এই নিয়ে আপসোস করছিল সেই কথাই বলল, এও হত নাকি? তুমি ঠেলে তুলে দিলে তাই।

আমি আবার ঠেললাম কখন? এতদিন হাতের কাছে পেয়েও একটা আঙুল পর্যন্ত ছুঁইনি।

সে ত্রুটি এখন পাঁচ গুণ পুষিয়ে নিচ্ছ।

কোথায়! বলে হাত বাড়াতে যাচ্ছিল মানব। ত্রস্ত চোখে এদিক ওদিক চেয়ে তৎক্ষণাৎ সরে গেল দীপা, 'এই, ভোলাদা রয়েছে না?'

বিয়েটা হয়ে গিয়েছিল রেজাল্ট বেরোবার আগেই।

কৃষ্ণা আর বেশী দেরি করেনি। মানবের মার সঙ্গে কথাবার্তা বলে কয়েকদিনের মধ্যেই ওদের দুজনকে মৃগেন বিশ্বাসের অফিসে তুলেছিল।

সুভাষিণী এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন। বলেছিলেন, দীপার বাবা-মা যে ওদের আশীর্বাদ করছেন এই যথেষ্ট। বিয়ে যেমন করেই হোক বৌ-ভাত তো আছে। আমাদের সাধ-আহ্লাদ যা কিছু সাধ্যমত সেদিনই মেটাবার চেষ্টা করব। তোমাদের তিনজনকে কিন্তু যেতে হবে মা। তুমি আর তোমাদের আর দুটি বন্ধু।

প্রসূন এখানে নেই, শোভনকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব। আর আমার কথা বলতে হবে না মাসিমা। দীপার বিয়ে—

তবু সুভাষিণী কৃষ্ণার মা'র সঙ্গে দেখা করে তাঁর অনুমতি নিয়েছিলেন। শোভন গিয়েছিল বৌভাতে। কৃষ্ণা শেষ পর্যন্ত যেতে পারেনি।

ম্যারেজ রেজিস্টারে সাক্ষী হিসাবে সই করেছিল ওরা দুজন।

রেজাল্ট বেরোবার মাসখানেকের মধ্যে মানব তার কলেজে লেকচারার হয়ে ঢুকল। প্রিন্সিপ্যাল ওর জন্যেই জায়গা খালি রেখেছিলেন। কলেজ ওদের গ্রাম মালীগাঁ থেকে মাইল তিনেক দূর। সাইকেলে যাতায়াত করত।

স্থানীয় বি ডি ও এবং এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন অফিসারের সঙ্গে আগেই পরিচয় ছিল। তাঁদের পরামর্শে উন্নত ধরনের চাষবাসের জন্যে কি কি সরঞ্জাম এবং নিয়ম পদ্ধতি দরকার তা নিয়ে উদ্যোগ আয়োজন শুরু করে দিয়েছিল।

বিয়ের পরে কিছুদিন দীপা মালীগাঁতেই থেকে গিয়েছিল। গ্রামের বাড়ি এবং গ্রাম্য-জীবনের চাল-চলনের সঙ্গে যতটা সম্ভব নিজেকে খাপ-খাইয়ে নেবার চেষ্টা ও উৎসাহের অভাব ছিল না।

তবু সুভাষিনী বুঝেছিলেন এক নাগাড়ে ওখানে থাকায় তার অসুবিধা হবে। তার দরকারও নেই। কোলকাতায় তো একটা আস্তানা রয়ে গেছে।

নিজেই উদ্যোগী হয়ে ছেলে বৌকে বাগবাজারে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তখন কলেজে ছুটি চলছে।

মানব জানত দীপার বরাবরের ইচ্ছা এম-এ পাশ করার পর রিসার্চের দিকে যাবে। বিয়ে না হলে তাই যেত। প্রফেসর চৌধুরী সেজন্য ওকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়ে রেখেছিলেন। কয়েকটা

বিষয়ও ঠিক করে দিয়েছিলেন। তার মধ্যে যেটা হোক বেছে নেবে। সাহায্যের আশ্বাস তো ছিলই।

বিয়ে হল বলে সে প্ল্যান ভেস্তে যাবে এটা মানবের ইচ্ছা নয়। একদিন বলল, প্রফেসর চৌধুরীর সঙ্গে একবার দেখা করে এসো।

কেন ?

বাঃ, রিসার্চ শুরু করতে হবে না ?

তার মানে তো রোজই ইউনিভার্সিটিতে যাওয়া।

তাই যাবে। অসুবিধে কিসের ?

কী রকম ? তুমি থাকবে দেশে আর আমি এখানে লাইব্রেরীতে ধরনা দিতে থাকবো, তাই হয় নাকি ?

দোষ কী ?

একদিন দুদিনের ব্যাপার নয়। মা কী মনে করবেন ?

কিছু মনে করবেন না। তাছাড়া ছুটি ছাটা হলেই আমি আসব, আর তুমিও যখন সুযোগ পাবে যাবে। মাও মাঝে মাঝে এসে থাকবেন এখানে, যেমন থাকেন।

দাঁড়াও ভেবে দেখি।

এর মধ্যে আবার ভাববার কী আছে ?

শেষপর্যন্ত সেই ব্যবস্থাই হল, সুভাষিণী খুশী হলেন। বললেন, ভালোই হল। আমি যখন আসি বড্ড একা একা লাগে। এবার তোমাকে কাছে পাব।

আসলে উনি সংসার ফেলে বড় একটা আসতে পারতেন না। মানব আসত ফি শনিবার। সোমবার ভোরের গাড়িতে চলে যেত। ছুটিগুলোও প্রায় এখানে কাটাত।

দীপা মাঝে মাঝে হঠাৎ গিয়ে হাজির হত। দু-একদিন থেকে চলে আসত।

এ কাহিনী এখানেই শেষ হতে পারত।

সুখ-সমাপ্তির রেখা টেনে দিয়ে এ লেখকও সত্যিই সুখী হত এবং তার পূর্বসূরীদের অনুকরণে বলতে পারত "অতঃপর তাহারা সুখে শান্তিতে ঘর করিতে লাগিল।"

বেশির ভাগ পাঠক পাঠিকাও তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে স্বচ্ছন্দ মনে যে যার কাজে চলে যেতেন। মনের কোণে কোনো দুঃখ বা বেদনার রেশ টেনে নিয়ে বেড়াতে হত না।

সমালোচকেরা অবশ্য খুশী হতেন না। 'জলো' 'ইচ্ছাপূরক', 'অবিশ্বাস্য' ইত্যাদি যে কটা বাঁধা বিশেষণ আছে তাঁদের তূণে, নির্বিচারে প্রয়োগ করে একে ধূলিসাৎ করে দিতেন। ওজনে ভারী না হলে যারা 'ফিকশনের' মূল্য দিতে নারাজ সে সব পাঠকও হয় তো নিরাশ হতেন।

এদের কথা লেখক ভাবছেনা। তার বক্তব্য হল, সে একটি কাহিনী শোনাতে বসেছিল ইচ্ছা ছিল এই পর্যন্ত এসেই তাকে 'সমাপ্ত' বলে ঘোষণা করবে। সেটা হল না।

কেন হলনা বলা বড় কঠিন।

একটা কারণ হতে পারে, চরিত্রগুলো তার 'সৃষ্টি' হলেও শুরুতে হয় তো তার মতে চলে, একটু এগিয়ে যাবার পর আর বশে থাকে না, নিজেদের ইচ্ছামত পথ করে নেয়। বার্নার্ড শ'র মত অতবড় স্রষ্টাও সেটা অনুভব করেছিলেন এবং তাঁর স্বভাব সুলভ ভাষা ও ভঙ্গিতে বলেছিলেন, "I have no more control over them than over my wife.

তার চেয়েও বড় কারণ বোধহয় এই—জীবনকে আমরা যত সহজ সরল মসৃণ বলে মনে করি আসলে সে তা নয়। তার অনেক বাঁক, অনেক মোড়। পদে পদে তাকে নতুন নতুন

জটিলতার মধ্যে গিয়ে পড়তে হয়, জট ছাড়াতে ছাড়াতে চলতে হয়।

সেই বন্ধুর পথের পতন অভ্যুদয়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে লেখককেও এগোতে হয়। ইচ্ছামত থেমে যাবার উপায় নেই।

মানুষের যিনি ভাগ্যবিধাতা তিনি নির্দয় না মঙ্গলময় তা নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে, কিন্তু তিনি যে অতি সুরসিক সে বিষয়ে মতান্তর নেই। মানুষকে নিয়ে তিনি কত না কৌতুক করে চলেছেন। কাউকে হাসাচ্ছেন, কাউকে কাঁদাচ্ছেন।

কখনো দেখা যায় রৌদ্রালোকিত স্বচ্ছ আকাশের দিকে চেয়ে যারা যাত্রা শুরু করবে বলে ভাবছিল, হঠাৎ কোথা থেকে একরাশ মেঘ এনে তাদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

মানব ও দীপার নতুন গড়া সংসারেও এমনি একখণ্ড মেঘের ছায়া পড়ল। অকস্মাৎ ও অজ্ঞাতসারে।

॥ ছয় ॥

একদিন মানব এসেছে বাগবাজারের বাড়িতে। দীপা গিয়েছিল লাইব্রেরীতে। ফিরে এসে কথাবার্তার মধ্যে হঠাৎ মনে পড়তেই বলল, ও-ও, তোমার নামে একটা ম্যাগাজিন এসেছে। ঠিক তোমার নামে নয়—

বলতে বলতে উঠে গিয়ে কাগজটা নিয়ে এল। উপরে ইংরেজিতে লেখা—মিস মানসী রায় কেয়ার অব মানব মুখার্জি। তারপর ওদের বাসার ঠিকানা।

মানব যখন দেখছে, দীপা জিজ্ঞাসা করল মানসী রায় কে?

জানি না তো।

সে কী? তোমার কেয়ারে পাঠিয়েছে। অথচ—দেখি,

কাগজখানা নিয়ে মোড়কটা খুলে ফেলল।

একখানা বাংলা মাসিক পত্র। চটি ধরনের। নাম—মোহিনী। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলল, ওঁর একটা কবিতাও আছে দেখছি। তাই পাঠিয়েছে।……বাব্‌বা এসব আধুনিক কবিতার হেঁয়ালি বোঝা আমার সাধ্য নয়। তুমি পার কিনা ছাখ।

কাগজটা বাড়িয়ে ধরল দীপা। মানব হাত না বাড়িয়েই বলল, থাক, ওসব আমার মাথায় ঢুকবে না।

আহা, তুমি ওঁকে না চিনলেও উনি নিশ্চয়ই তোমাকে চেনেন। তাই তোমার কাছে পাঠাতে বলেছেন কাগজটা, ওঁর কবিতাটা যাতে

তোমার চোখে পড়ে। কিছু প্রেম-ট্রেমও আছে ওর মধ্যে। দ্যাখ না পড়ে!

দীপার ঠোঁটে চাপা হাসি।

মানব মুখে একটা ছদ্ম সিরিয়াস ভাব নিয়ে বলল, ইস, তাহলে তো গোড়াতেই মস্তবড় ভুল করে বসে আছেন ভদ্রমহিলা। সিলড্ কভারে সোজা আমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত ছিল, যাতে বৌ-এর হাতে না পড়ে।

বৌ-টৌএর খবর হয়তো জানেন না।

তা অবিশ্যি হতে পারে। কিন্তু সোজা আমাকে না পাঠিয়ে তার ওপরে আবার নিজের নামটা জুড়ে দিলেন কেন?

ওটা টু নয়, আসলে ফ্রম্।

এবার মানব হেসে ফেলল। তারপর বলল, তুমি এক কাজ কর। রিসার্চ ফিসার্চ ছেড়ে ল কলেজে ভর্তি হয়ে যাও। এ রকম একটা ফার্স্ট ক্লাস ওকালতি ব্রেণ! বার-এ নির্ঘাত শাইন করবে।

দীপা তখনো যেন কী ভাবছিল। বলল, তা যাই বল, ব্যাপারটা রীতিমত মিসটিরিয়াস।

কিচ্ছু মিসটিরিয়াস নয়। ঐ কাগজের অফিসের ভুল। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে।

এই কাগজওয়ালারা তাহলে তোমাকে চেনে?

তা জানি না। তবে এই শোহিনী টোহিনীর নামও কখনো শুনিনি। এটা বরং ঠিকানা কেটে ওদের অফিসেই ফেরৎ দিয়ে দাও।

কী দরকার? থাক না। দেখা যাক, কেউ খোঁজ করতে আসে কিনা। কে জানে হয়তো কবি স্বয়ং এসে হাজির হতে পারেন।

দীপা ভোলানাথকে বলে রাখল, দুপুরের দিকে যখন আমি থাকি না, কেউ যদি একটা কাগজের খোঁজে আসে সন্ধ্যার পর আসতে বলে দিও।

মাস খানেক কেটে গেল। কেউ এল না। তারপর একদিন এল একটা চিঠি। ঐ একই নাম ঠিকানা। মানব তখন তার দেশের বাড়িতে। দীপা চিঠিটা খুলে ফেলল।

মানসী রায়-এর লেখা আর একটা কবিতা। সঙ্গে সম্পাদকের চিঠি। তিনি 'দুঃখের সহিত' জানাচ্ছেন, কবিতাটি মনোনীত হয়নি।

এটাকে ঠিক প্রেমের কবিতা বলা যায় না। রূপক-টুপকের আড়ালে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিছুটা ব্যঙ্গোক্তি আছে বলে মনে হয়। তবে বেশ কাঁচা হাতের লেখা।

পরের সপ্তাহে মানব শনিবার না এসে এল রবিবার। সোমবার তার ক্লাস ছিল না। ও দিনটা এখানে কাটিয়ে মঙ্গলবার যাবে, এই বোধ হয় ইচ্ছা। দীপা তখন বাড়ি ছিল। মালিগাঁর খবর-টবর জেনে নিয়েই বলল, তোমার সেই মানসীর একটা চিঠি এসেছে।

চিঠি !

'হ্যাঁ ; ঐ শোহিনী থেকে। আমি কিন্তু খুলে পড়েছি।

ড্রয়ার থেকে চিঠিটা বের করে মানবের সামনে রাখল। মানব খামটা না ধরেই গাম্ভীর্যের ভান করে বলল, অন্যায় করেছ। পরের চিঠি পড়লে কেন ?

না, সত্যি, একটা কিছু করা দরকার। কবিতাটা ওরা ছাপতে পারবে না বলে ফেরৎ দিয়ে দিয়েছে। ওদিকে উনি নিশ্চয়ই আশা করে বসে আছেন ছাপা হবে। আগেরটা যে বেরিয়ে গেছে সে খবরও নিশ্চয়ই পান নি।

তা আমাকে কী করতে বল ?

ঐ কাগজের আফিসে একবার যাও না। কে মানসী রায়, কেন বার বার তোমার কাছে তার কাগজ আসে, চিঠি আসে ?

হ্যাঃ ; আমি এখন কলেজ কামাই করে এই সব করে বেড়াই আর কি !

দীপাকে একটু চিন্তিত দেখাল। একটু কি ভেবে নিয়ে বলল, ব্যাপারটা আমার ভারী আশ্চর্য লাগছে। তুমি বলছ, তুমি ওকে চেন না। কিন্তু উনি নিশ্চয়ই তোমাকে চেনেন। তা না হলে তোমার ঠিকানা দেবেন কেন ?

মানব একটু বিরক্ত হল, আমি বুঝতে পাচ্ছি না, একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে তুমি খালি খালি মাথা ঘামাচ্ছ কেন ?

—কি জানো ? আমার ধারণা, কোনো কারণে এই মহিলা বাড়ির ঠিকানা গোপন রাখতে চান। তোমার ঠিকানা দেওয়া মানে তাঁর আশা বা ইচ্ছা তুমি এই কাগজ আর চিঠিপত্তরগুলো ওঁকে পৌঁছে দেবে।

আমি পৌছে দেব মানে ? রূঢ় প্রতিবাদের সুরে বলল মানব, আমি একশবার বলছি আমি একে চিনি না। তোমার সেটা বিশ্বাস হচ্ছে না ?'

চটছ কেন ? অবিশ্বাসের কথা তো আমি বলিনি।

স্পষ্ট করে বলনি। তবে তোমার কথার ভাবে মনে হচ্ছে, তোমার কাছ থেকে আমি যেন কিছু একটা লুকোচ্ছি।

তা যাই বল, জিনিসটা একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নয়। দেয়ার মাস্ট বি সামথিং ইন ইট।

বলে, দীপা আর সেখানে দাঁড়াল না। জোরে জোরে পা ফেলে চলে গেল।

কথা হচ্ছিল ওদের পড়বার ঘরে। মানব কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল। তারপর উঠে পড়ে শোবার ঘরে ঢুকে পাঞ্জাবিটা পরে নিয়ে সুটকেস হাতে বেরিয়ে এল।

বারান্দায় পড়তে দীপার সঙ্গে দেখা। বলল, কোথায় যাচ্ছ ?

বাড়ি।

এখন !

হ্যাঁ, জরুরী কাজ আছে ··

বলতে বলতে নেমে গেল।

সিঁড়ির মুখেই কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দীপা। সে জানে জরুরী কাজ নিছক বাজে অজুহাত। সত্য হলে মানব নিশ্চয়ই ওদিন আসত না এবং এসেই ওভাবে চলে যেত না। সে যে রাগ করে চলে যাচ্ছে একটা শিশুও তা বুঝতে পারে।

আহত অভিমানে রুদ্ধ কান্নার ঢেউ বুক পর্যন্ত ঠেলে উঠল। জোর করে চোখের জল রোধ করে সে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। মানব যে তার সঙ্গে এরকম রূঢ় ব্যবহার করতে পারে কখনো ভাবতে পারেনি দীপা।

অনেকক্ষণ কেটে যাবার পর মনটা একটু যখন ঠাণ্ডা হল, তখন নিজের কথাগুলো আস্তে আস্তে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। মনে হল, তার দিক থেকেও একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে।

ও যখন বারবার করে বলছে মানসী রায় বলে কাউকে সে চেনে না, তখন তারই উচিত ছিল চেপে যাওয়া। কোথাকার কোন একটা মেয়ে এভাবে তাদের মধ্যে একটা মনান্তর ঘটিয়ে দেবে সেটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

মনে মনে স্থির করল ও প্রসঙ্গ নিয়ে আর সে ঘাঁটাঘাঁটি করবে না।

ওদিকে মানব যখন রাস্তা থেকে একটা ট্যাকসি ডেকে নিয়ে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে গাড়ি ধরল তখন পর্যন্ত একটা প্রচণ্ড অভিমান তাকে যেন ঠেলে নিয়ে চলেছিল।

দীপা তাকে সন্দেহ করছে! সে যে ঐ মেয়েটাকে চেনে না, বারবার তার মুখ থেকে শুনেও বিশ্বাস করতে চাইছে না! ওদের ভিতরকার এত দিনের গভীর সম্পর্ক। সেটা কি এতই ঠুনকো?

ট্রেন যখন চলছিল এই কথাগুলোই পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরছিল তার মাথার মধ্যে। সারা মন ঐ নিয়েই আচ্ছন্ন হয়ে ছিল।

স্টেশনের পর স্টেশন চলে যাচ্ছিল। গাড়ি ক্রমশঃ ফাঁকা হয়ে আসছে। সেই সঙ্গে মানবের মনের ভিতরে ঠাসা ঐ চিন্তাগুলোর ভিড়ও যেন একটু ফাঁকা হয়ে এল।

তারপর একসময়ে মনে হল, তারও বোধ হয় অমন করে বেরিয়ে আসা ঠিক হয়নি। মেয়েরা একটু বেশী সেন্টিমেণ্টাল। তাছাড়া সব কিছুতে তাদের কৌতূহল। এ ব্যাপারে তো থাকবেই। এর মধ্যে একটা মেয়ের নাম জড়িয়ে আছে।

একথাও ভাবল মানব, তাকে অমন গভীর ভাবে ভালবাসে বলেই না ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিতে পারছে না দীপা। আর এর মধ্যে কোথাও যে একটা রহস্য আছে তা অস্বীকার করা যায় না। কে এই মানসী রায়? কেন এ ঠিকানায় তার চিঠিপত্র আসে?

একবার ইচ্ছা হল কালই ফিরে গিয়ে নিজে অগ্রণী হয়ে একটা মিটমাট করে ফেলবে। কিন্তু কোথায় যেন পৌরুষে বাধল। তাহলে স্ত্রীর কাছে কি সে বড্ড ছোট হয়ে যাবে না?

শনিবার আসতে মোটে তো আর ছটা দিন। দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তখন গেলেই হবে।

শনিবার সকালেই দিদি এবং জামাইবাবু এসে হাজির। অনেক

দিন পরে এসেছেন। তাদের ফেলে চলে আসাটা শুধু যে অশোভন তাই নয়, জামাইবাবুর মিঠেকড়া ঠাট্টার মুখে পড়তে হবে ভেবে না বেরোনই স্থির করল।

এদিকে দীপাও আশা করে ছিল সে আসবে। সাধারণতঃ যে সময়ে সে আসে সেটা তো মুখস্থ হয়ে গেছে। তারপর থেকে বারবার ঘর বার করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে কড়ানাড়ার শব্দ হতে নিজেই ছুটে গেল দরজা খুলতে। না, মানব নয়, ডাকপিওন। তার হাতে আর একখানা 'শোহিনী'। উপরে সেই নাম ঠিকানা। যে মনটা এ কদিনে অনেকটা নরম হয়ে এসেছিল, একটা অবাঞ্ছিত অপ্রিয় ঘটনার মধুর সমাপ্তির দিকে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল, হঠাৎ আবার সে কঠিন আকার নিয়ে বসল।

মানসী রায়ের এবারে যে কবিতাটি ছিল তার প্রথম কটা লাইনে চোখ বুলিয়েই গা জ্বালা করে উঠল দীপার। নাম 'প্রতীক্ষা'।

"তুমি কি চিরদিনই নেপথ্যে থেকে যাবে?
একটিবার আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়াবে না?
তবু আমি তোমার জন্যে প্রতীক্ষা করে থাকবো।
তুমি আমাকে চেন না।
কিন্তু আমি তো তোমাকে চিনি।
আমার হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভরে আছ তুমি।"

দীপা বাকীটা আর পড়তে পারল না, কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

এই বাড়ি এই ঘরগুলো যেন তার শ্বাসরোধ করে ধরল। মনে হল, এই মুহূর্তে কোথাও ছুটে পালায়।

কিন্তু কোথায় যাবে? প্রথমেই মনে হল মার কথা। বিয়ের পর একদিনও মা-বাবার কাছে যায় নি।

মা তো কখনো বলেননি, তুই আর আসিস না। বরং যেতেই বলেছিলেন 'কোলকাতায় আসবি তো মাঝে মাঝে। তখন একবার ঘুরে যাস। মানব নিশ্চয়ই কিছু মনে করবে না।'

বিয়ের দিনটাই বিশেষ করে মনে পড়ল দীপার। ম্যারেজ রেজিস্ট্রার সময় দিয়েছিলেন সাড়ে পাঁচটা।

বাবা বোধ হয় ইচ্ছা করেই সেদিন সকালে মফঃস্বলে একটা কেস নিয়ে চলে গিয়েছিলেন।

চারটার সময় যখন তৈরি হবার আয়োজন করছে, প্রমীলা এলেন তার ঘরে—'ও কী কাপড় বের করেছিস?'

এই তো ভাল।

ওটা তুলে রাখ। তোর কাপড় আমি কিনে রেখেছি। দাঁড়া, নিয়ে আসছি।

দামী বেনারসী নিয়ে ফিরে আসতেই দীপা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, এ করেছ কী! এটা পরে রেজেস্ট্রি অফিসে গেলে সবাই ঠাট্টা করবে।

কেউ ঠাট্টা করবে না। বিয়ের দিনে সবাই বেনারসী পরে।

দীপা আর আপত্তি করল না। জানে, করলেও মা শুনবে না। কিন্তু আবার গিয়ে যখন গয়নার বাক্সটা নিয়ে এলেন, তখন বেঁকে বসল—'না, মা। বাবা যখন আমার বিয়ে দিচ্ছেন না তখন এ গয়না আমি নেবো না। আমার গায়ে যা আছে তাই ঢের।

এর এক কুচো সোনাও তোর বাবা দেননি। সবটাই আমার। আমি ভেঙে তোর জন্যে গড়িয়ে রেখেছি।

কেন তুমি তোমার নিজের গয়না ভাঙতে গেলে ?

পাগল ! আমার সেই সেকেলে ডিজাইন কি এখন চলে ? সব হাল-আমলের গয়না। দ্যাখনা ?

বলে একটি একটি করে নিজেই পরিয়ে দিতে লাগলেন।

দীপা আর কিছু বলতে পারল না। তার দু' চোখ জলে ভরে উঠেছিল।

কৃষ্ণা যখন তাদের বাড়িতে দীপাকে নিতে এল, খানিকক্ষণ বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। তারপর চাপা গলায় বলল, তোকে দেখে আমারই মাথা ঘুরে যাচ্ছে, সে বেচারা নির্ঘাৎ ফেইণ্ট হয়ে পড়বে। করেছিস কী !

দ্যাখ না মার কাণ্ড। বলছে, ওখান থেকেই তো শ্বশুরবাড়ি গিয়ে উঠবি। যেমন তেমন করে গেলে কি চলে ?

ঠিকই বলেছেন, বলল কৃষ্ণা।

সেই দিনটার কথা, তার সঙ্গে মার মুখখানা বারবার করে মনে পড়ছিল দীপার।

ঘরে গিয়ে সামান্য কিছু কাপড় চোপড় একটা সুটকেসে ভরে নিয়ে ভোলানাথকে বলল একটা ট্যাকসি ডাকতে।

গাড়িতে যখন উঠছে ভোলা বলল, তুমি কি মালিগাঁয় যাচ্ছ বৌদিমণি ?

না, ভোলাদা। আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। বাবু এলে বলো।

কবে ফিরবে ?

ঠিক বলতে পারছি না।

পরের সপ্তাহে মানব এসে ঐ কথাই শুনল। কোন প্রশ্ন করল না। ভোলানাথ কী ভাববে !

কিন্তু কোথায় যেতে পারে দীপা? বাপের বাড়ির কথা তার মনে হল না। বিয়ের পর তো একবারও যায় নি। মানব তার থেকেই ধরে নিয়েছিল বাবা-মার সঙ্গে দীপার বিরোধ না থাক বিচ্ছেদ এখনো মেটেনি। এক কৃষ্ণার কাছে যেতে পারে। কিন্তু এতদিন সেখানে কাটানো সম্ভব বলে মনে হল না।

তবে কি একাই কোথাও বাইরে চলে গেল? পুরী বা দেওঘর বা ঐরকম কোন জায়গায়?

কৃষ্ণার কাছেই গেল মানব, যদি কোন খোঁজ পাওয়া যায়। যেতেই তার প্রথম কথা হল—তুমি একা যে? গিন্নী এল না?

মানব কী বলবে ভেবে ঠিক করার আগেই দ্বিতীয় প্রশ্ন—কথা বলছ না যে? ঝগড়াঝাটি হয়েছে বুঝি? যাকে বলে দাম্পত্য কলহ? তা ওরকম এক-আধটু হওয়া ভাল। না হলে প্রেম পানসে হয়ে যায়।

মুখ টিপে হাসল কৃষ্ণা।

মানব ততক্ষণে স্থির করে ফেলেছে, এরা তিনজনই অনেক দিনের বন্ধু, এর কাছে কিছু লুকোবে না। বিশেষ করে ওদের বিয়ের ব্যাপারে কৃষ্ণাই তো সব কিছু করেছে।

বলল, তার খবরের জন্যেই তোমার কাছে এসেছি।

মানে?

কৃষ্ণা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

'শোহিনীর'** প্রসঙ্গটা অনুক্ত রেখে ওদের দুজনের যে একটা মনোমালিন্যের ব্যাপার ঘটে গেছেঁ সেইটুকু বলল মানব।

কৃষ্ণা বলল, কোথায় আর যাবে? গোসা হলে বৌএরা যেখানে গিয়ে থাকে ও-ও সেখানে গ্যাছে। দাঁড়াও ফোন করে দেখি।

রবিবার। প্রাণতোষবাবু বাড়িতেই ছিলেন। তিনিই ধরলেন ফোন—হ্যালো। ও, কৃষ্ণা? কেমন আছ তোমরা?

ভাল আছি মেসোমশাই।

দীপাকে ডেকে দেবো?

হ্যাঁ, একটুখানি—

দীপা এসে সাড়া দিতেই কৃষ্ণা বলল, বিরহের পালা আর কদ্দিন চলবে? এ দিকে তোর প্রাণেশ্বরের যে প্রাণ যায়। আমার কাছে এসে শুকনো মুখে বসে আছে। ফোনটা দিচ্ছি।

না; ত্রস্ত কণ্ঠে বলল দীপা।

ও, তাও তো বটে। ওখানে মেসোমশাই রয়েছেন। প্রেমালাপ চলবে না।

শোন, আমি এখন একটু বেরোচ্ছি। তোর কাছে কাল যাবো। পাঁচটায়। থাকিস কিন্তু। বলেই ফোন ছেড়ে দিল দীপা।

ফোনে যে কথা হল মানবকে জানাতে সে কিছু বলল না। মনে মনে বুঝল, আসলে তাকে এড়িয়ে গেল দীপা। এর পরে আর কী করা যায়?

দীপা এল পরদিন। কৃষ্ণা লক্ষ করল, সে উৎফুল্ল ভাব মোটেই নেই। মুখ শুকনো। চোখের কোলে কালি। কৃষ্ণা চিন্তিত হল, তার কথাতেও সেটা অস্পষ্ট রইল না। "কী ব্যাপার বল তো?"

আচ্ছা, আমাদের সময় মানসী রায় বলে ইউনিভার্সিটিতে কেউ পড়ত জানিস?

না তো। কেন?

না, এমনিই জিজ্ঞেস করছি।

কৃষ্ণা অত সহজে ছাড়লনা। হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন জানবার জন্যে

কিছুটা পীড়াপীড়ি করতে, দীপা শুধু বলল, তোকে সব বলবো। তার আগে একটু খবর নে তো।

তা না হয় নেবো। কিন্তু তুই বাগবাজারে যাচ্ছিস কবে?

যাব শিগগিরই।

কৃষ্ণাকে শুধু এইটুকুই জানাল।

কিন্তু এদিকে নিজে তো জানে বেশী দিন মার কাছেও থাকা চলে না। মাস খানেক তো হল। এরই মধ্যে ক দিন জানতে চেয়েছেন, মানবের চিঠিপত্র এসেছে কিনা, বা সে ফোন করেছে কিনা। এর পরে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠবেন—কিছু একটা ঘটেছে ওদের মধ্যে। দীপা সেটা মোটেই চায় না। ওরা সুখে আছে, আনন্দে আছে, মাকে বাবাকে সেটা দেখাতেই হবে।

আরো দিন কয়েক পরে সকালের দিকে বাগবাজারে এসে শুনল, মানব ক'দিন এখানে কাটিয়ে আগের দিন মালিগাঁয়ে ফিরে গেছে।

ভোলানাথ খুব খুশী, দীপা ফিরে এসেছে। কিন্তু বৌদিমণির মুখচোখের পরিবর্তন তার চোখও এড়াল না। বলল, দাদাবাবু বলছিল তুমি কোথায় যেন বেড়াতে গ্যাছ। হোটেল ফোটেলের রান্না কি তোমাদের পোষায়? যাক, এখন বিশ্রাম নাও। নয় তো এক কাজ কর। কদিন মালিগাঁয়ে ঘুরে এসো। তোমার একটু যত্ন আত্তি দরকার। সেটা মা যেমন করবেন তেমন কি আর আমি পারি?

দীপা মনে মনে খুশী হল। এই ভোলানাথও তার জন্যে ভাবে। অথচ যে মানুষটার কথা ভেবে—যাক সে-কথা। বলল, না ভোলাদা, আমাকে এখন এখানেই থাকতে হবে। আবার লেখাপড়া শুরু করা দরকার।

আচ্ছা, আমি তোমার জন্যে চা নিয়ে আসি।

না, চা আর এখন খাবোনা। তুমি বরং এই ঘরটা একটু ঝেড়ে ঝুড়ে গুছিয়ে টুছিয়ে দাও।

এখনই দিচ্ছি।

পড়বার ঘরে যে তক্তোপোষটা ছিল শুধু সতরঞ্চি ঢাকা, তার উপরে একটা তোষক ও চাদরের ব্যবস্থা করেছিল দীপা। ভোলানাথ সেটা তুলে নিয়ে গেল রোদে দিতে। দীপা তখন ও ঘরে ছিল।

এ-ঘরে ঢুকতেই নজরে পড়ল সতরঞ্চির উপর একটা কি কাগজের প্যাকেট। কাছে যেতেই বুকের ভিতরটা কঠিন হয়ে উঠল। ভোলানাথকে ডেকে বলল, এই কাগজটা বিছানার নীচে তুমি রেখেছ?

না, না, আমি কেন রাখতে যাবো? আমি সব চিঠিপত্তর কাগজ-টাগজ যা আসে সব ঐ টেবিলের উপর গুছিয়ে রাখি।

কথাটা সত্য। তাহলে এটা তারই কাজ।

গত সপ্তাহের শোহিনী। পাছে এর মধ্যে আমি এসে পড়ি এবং এটা আমার নজরে পড়ে, তাই তোষকের তলায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে, মনে মনে বলল দীপা। এর মধ্যেও নিশ্চয়ই আর একটা প্রেমের কবিতা আছে। মোড়কটা যখন নেই, সেটা যার উদ্দেশে লেখা তার কাছে ঠিক পৌঁছে গেছে।

কাগজটা খুলে দেখতে আর প্রবৃত্তি হল না।

চোখ দুটো দপ করে জ্বলে উঠল। না, এর পরে আর বসে থাকা চলে না। কিছু একটা করতে হবে। সামথিং মাস্ট বি ডান—ডান হাতটা মুঠো করে দৃঢ় চাপা গলায় বলল দীপা।

পাশের বাড়ির বৌটির সঙ্গে দীপার খুব ভাব। ওদের ফোন আছে। সেখান থেকে ডাকল কৃষ্ণাকে—মানসী রায়ের খোঁজ পেলি?

কোত্থেকে বলছিস ?

বাগবাজার থেকে।

তাহলে দীর্ঘ বিরহের অবসান ? মানব আছে নাকি ?

না। আমি যা বললাম, তার জবাব দে।

খোঁজ নিয়েছিলাম। মানসী-টানসী বলে কেউ ছিল না আমাদের টাইম-এ। হঠাৎ এ খবরে তোর দরকার পড়ল কি জন্যে ?

হঠাৎ নয়। তুই একবার আসবি ?

তোকে যেন কেমন একসাইটেড মনে হচ্ছে। কী হয়েছে তোর ?

তুই আয়। তারপর বলবো।

বিকেলেই এল কৃষ্ণা। দীপা এতক্ষণ ছটফট করছিল। তার মন এমন ভারাক্রান্ত যে কারো কাছে খুলে না ধরে উপায় ছিল না।

কৃষ্ণা সব শুনল, অন্য সময় যেমন সব কিছু ঠাট্টা পরিহাসের স্নিগ্ধ হাওয়া দিয়ে উড়িয়ে দেয় এখন সে পথে গেল না। সিরিয়াস ভাবেই বলল, তোর চঞ্চল হবার কারণ আছে, আমি অস্বীকার করছিনা। ব্যাপারটা সত্যিই ভারী আশ্চর্য। তবু আমার মনে হয় তুই মিথ্যা সন্দেহ করছিস। মানবের মতো টিমিড, সারাক্ষণ পড়াশুনো নিয়ে থাকা, যার মধ্যে স্মার্টনেসের কোন বালাই নেই, তেমন একটা ছেলে কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে যাবে না।

তুই ভুল করছিস। এ একটা টাইপ। বাইরে ভিজেবেড়াল, ওদিকে ডুবে ডুবে জল খাচ্ছে। এরা ভীষণ ডেঞ্জারাস।

মানলাম। আগে যদি কোনো অ্যাফেয়ার হয়েও থাকে, এখন তো আর কিছু করছে না।

কে জানে ? আমি তো আর সব সময় গার্ড দিয়ে বেড়াচ্ছিনা।

তুই এক কাজ কর। তোর রিসার্চ ফিসার্চ আপাততঃ কিছুদিন বন্ধ রেখে ওদের বাড়িতে গিয়ে থাক।

দীপা কি যেন ভাবতে লাগল।

কৃষ্ণা শেষ পর্যন্ত বলে গেল, ফস করে ড্রাসটিক কিছু করে বসিসনা যেন।

পরের সপ্তাহে মানব কোনো কারণে আসতে পারলনা।

যদি আসত হয়তো খানিকটা কড়া কড়া কথা-কাটাকাটি কিংবা ঝগড়াঝাঁটির ঝড় উঠত। দীপার তরফে কিছু গর্জন ও বর্ষণ। ফলে মেঘ কেটে গিয়ে দুজনের মনের আকাশ পরিষ্কার হয়ে যেতে পারত।

কিন্তু সংসারে যখন যেটি ঘটা দরকার প্রায়ই তা ঘটেনা। মানবের এই না-আসাটা—যাকে ইচ্ছাকৃত বলে ধরে নিল দীপা—তার তিক্ত বিক্ষুব্ধ সন্দিগ্ধ মনকে আরো বিষাক্ত করে তুলল।

॥ সাত ॥

অতীশ তার নিজের চেম্বারে বসে কাজ করছিল। হঠাৎ মুখ তুলে নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারলনা। কয়েক সেকেণ্ড কেটে যাবার পর মুখ থেকে একটি কথাই বেরোল—'তুমি!'

আমার ওপর কি আপনি রাগ করেছেন?

না, না, রাগ করবো কেন? বসো, বসো। কী ব্যাপার? হঠাৎ এই অসময়ে?

দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকাল। রাত্র সাড়ে সাতটার কাছাকাছি।

দীপা বলল, অন্য সময় তো আপনি ব্যস্ত থাকেন। লোকজন থাকে। তাই একটু রাত করে এলাম। আমার একটা জরুরী ব্যাপার আছে যার জন্যে আপনার সাহায্য দরকার।

কী বল দিকিন?

উদ্বিগ্ন মুখে জানতে চাইল অতীশ।

এটা যেন আর কারো কানে না যায়, এমন কি আমার বাবা-মাও যেন জানতে না পারেন।

সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। একে তো আমাদের প্রফেশনের প্রথম কথাই হল সিক্রেসি, তার ওপরে তুমি বলছ।

মানসী রায় সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার এবং তা নিয়ে কখন কি ঘটেছে সব শুরু থেকে বলে গেল দীপা।

অতীশ মন দিয়ে শুনল। মাঝে মাঝে ওর যেটুকু জানা দরকার

প্রশ্ন করে জেনে নিল। দীপার বক্তব্য শেষ হবার পরেও কিছুক্ষণ কি ভেবে নিয়ে বলল, তুমি আর তোমার স্বামীর সঙ্গে থাকতে চাওনা ?

না।

কিন্তু ডিভোর্স বা জুডিশিয়াল সেপারেশন কোনটাই সহজ নয়। এ ক্ষেত্রে আরো কঠিন। শুধু একটা নামের সঙ্গে তো লড়াই করা যায় না। নামের পেছনে যে মেয়েটি বা মহিলাটি আছে, তাকে বের করা দরকার। শুধু বের করলেই হবে না, তার সঙ্গে তোমার স্বামীর যে একটা যাকে বলে, অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে, তাও প্রমাণ করতে হবে। সে রকম কিছু—

না। সে রকম আমি কিছুই জানি না।

'তাহলে'—বলে ভাবতে লাগল অতীশ।

দীপা ছলছল চোখে অনুনয়ের সুরে বলল, আপনাকে একটা কিছু করতেই হবে অতীশদা।

দাঁড়াও। অতটা অধীর হয়োনা। এসব ক্ষেত্রে সবচেয়ে যা দরকার সেটা হচ্ছে মাথা ঠিক রাখা।...একটা ফৌজদারি কেস বোধহয় করা যেতে পারে। বিয়ের আগেই এই মেয়েটির সঙ্গে তার যে গোপন সম্পর্ক ছিল সেটা লুকিয়ে রেখে আমার স্বামী আমার সঙ্গে প্রতারণা বা বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন—এই বলে মামলা দায়ের করা। তাহলে কোর্টই পুলিসকে অর্ডার দেবেন মেয়েটাকে খুঁজে বের করতে।

আপনি যা ভাল মনে করেন করুন। আমি আর কিছু ভাবতে পারছিনা।

আমি তো ফৌজদারি কোর্টে যাই না। আমার এক বন্ধু আছে, তাকে দিয়ে করাবো। সেও সব ব্যাপারটা গোপন রাখবে। সে জন্মে তোমার কোন চিন্তা নেই।

খরচ পত্তর বাবদ—বলে, ভ্যানিটি ব্যাগটা খুলতে যাচ্ছিল দীপা।

অতীশ বাধা দিল—সেসব পরে দেখা যাবে। এখন তোমাকে কিছু ভাবতে হবেনা। শুধু আরেকবার আসতে হবে। এর মধ্যে আমার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলে রাখবো।

কবে আসবো বলুন ?

অতীশ তার ডায়েরী দেখে বলল, ১৩ তারিখ এই সময়ে সুবিধে হবে ?

তাই আসবো।

ওখান থেকে বাগবাজারে ফিরে গেল দীপা। পরদিন সকালে জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেল ভবানীপুরের বাড়িতে। ভোলানাথকে বলে গেল, বাবা-মার কাছে যাচ্ছি। বেশ কিছুদিন আসতে পারবো না। মার অসুখ।

প্রমীলা খুশী হলেন, একটু আশ্চর্যও হলেন।

কিছু জিজ্ঞাসা করার আগে দীপা নিজে থেকেই বলল, বাগবাজারের বাসাটা তুলে দেওয়া হচ্ছে। লোকজন লেগেছে বাঁধাছাঁদার কাজে। শাশুড়ী আর এখন আসতে পারেন না, বয়স হয়েছে। ও তো ওখানেই চাকরি করে। শুধু আমার রিসার্চের জন্যে মাসে মাসে অতগুলো টাকা গোনার কোনো মানে হয় না। তাই আমিই বললাম বাসা ছেড়ে দাও। আমি আমাদের বাড়ি থেকেই ইউনিভার্সিটিতে যাতায়াত করতে পারবো।

প্রাণতোষ শুনে বললেন, এটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছিস। অনেক আগেই করা উচিত ছিল। ওখানে একা একা থাকার দরকার কী ?

কয়েকদিনের মধ্যেই মানবের কাছে কোর্টের সমন গেল।

কাগজটা উল্টেপাল্টে চোখ বুলিয়ে প্রথমে কিছু বুঝতেই পারল না। ভালো করে পড়ে দেখেও মনে হল, কেউ তাকে নিয়ে ঠাট্টা করছে না তো? বাদীর নাম রয়েছে দীপালি যুখার্জি আর সে হল আসামী। আই পি, সি-র গোটা তুই ধারার উল্লেখ রয়েছে। সেগুলোর অর্থ সে জানে না।

শেষকালে তার নামে মামলা করল দীপা! ক্ষোভে অভিমানে তুঃখে তার চোখ ফেটে জল এল। এ যখন জানাজানি হয়ে যাবে লোকের কাছে সে মুখ দেখাবে কেমন করে?

সবচেয়ে বড় ভয় হল মার কানে যদি যায়। কালও বলেছেন, বৌমা অনেকদিন আসেনি। একবার গিয়ে নিয়ে আয়। বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে।

সমনটাকে তার ড্রয়ারে চাবিবন্ধ করে ভাবতে বসল কী করা যায়। দীপার সঙ্গে দেখা করবে?

ক্রমশঃ ভিতরটা শক্ত হয়ে উঠল, ঠিক আছে। সেও লড়বে। তারপর জেলে যেতে হয় যাবে। তবু বৌ এর কাছে মাথা নোয়াবে না।

পরদিনই চলে গেল কোলকাতায়। বন্ধুস্থানীয় উকিল ছিল একজন। তার কাছে গেল না। মনে মনে হাসবে। অচেনা উকিল ধরল। তিনি বললেন, তারিখের দিন কোর্টে হাজির হতেই হবে। তারপর জামিনে খালাস করিয়ে নেবো।

আশঙ্কা ছিল দীপার সঙ্গে দেখা হবে। না সে আসেনি। পিটিশন দাখিল করার দিন তাকে আসতে হয়েছিল। পরে কেস চালাবেন তার উকিল। তিনি উপস্থিত ছিলেন। অতীশের বন্ধু

অচিন্ত্য দে। তিনি জামিনের বিরোধিতা করলেন না, মানব নিজেকে নির্দোষ বলল এবং অচিন্ত্যবাবুর প্রশ্নের উত্তরে জানাল, মানসী রায় বলে কাউকে সে চেনে না।

তারপর কিছুক্ষণ আলোচনা। মামলা মুলতবী রইল। কোর্ট পুলিশকে নির্দেশ দিলেন মানসী রায়কে খুঁজে বের করতে।

থানা থেকে একজন অফিসার প্রথমেই গেলেন শোহিনী-সম্পাদকের কাছে।

তিনি বললেন, হ্যাঁ, এঁর কবিতা আমার কাগজে ছাপা হয়। কিন্তু ইনি নিজে কখনো আসেননি। কবিতাগুলো প্রায়ই ডাকে আসে। দু-একবার একটি ছেলে এসে দিয়ে গিয়েছিল। তার নাম-ঠিকানা জানি না। মানসী রায় তার যে ঠিকানা দিয়েছেন সেটা এই। এখানেই আমরা কাগজ পাঠিয়ে থাকি।···

বলে মানব মুখার্জির ঠিকানা বের করে দিলেন।

পুলিশ অফিসার মনে মনে হাসলেন, এটা নিয়েই তো মামলা। সম্পাদককে বলে গেলেন, সেই ছেলেটি কিংবা অন্য কেউ যদি মানসী রায়ের তরফ থেকে আসে তাকে বসিয়ে রেখে আমায় একটা ফোন করে দেবেন।

সম্পাদক কিছুটা ভয় পেলেন। ফোন নম্বরটা টুকে নিয়ে বললেন, আমাদের কোনো ফ্যাসাদে পড়তে হবে না তো? আমরা গুড ফেইথে ছেপেছি মশাই। মেয়েদের লেখা বেশির ভাগ অন্যের মারফতই আসে।

পুলিশ অফিসার আশ্বাস দিলেন, না না। আপনাদের বিরুদ্ধে কিছু নেই।

দু-সপ্তাহ যেতে না যেতেই থানায় টেলিফোন করলেন সম্পাদক 'এসেছে'।

সেই অফিসারই ধরলেন এবং জানিয়ে দিলেন, একটু বসতে বলুন। আমি এখনি আসছি।

একটি সতের-আঠার বছরের ছেলে। পুলিশ দেখে প্রথমটা ঘাবড়ে গেল।

অফিসার আশ্বাস দিলেন, একটা কেসের ইনভেসটিগেশনে তোমার একটু সাহায্য দরকার, আর কিছু নয়।

তার নাম ঠিকানা জেনে নিয়ে প্রশ্ন করলেন, এই মানসী রায়, যাঁর কবিতা এঁদের কাগজে বেরোয় তাঁকে তুমি নিশ্চয়ই চেনো?

চিনি।

তোমার কিছু হন নাকি?

না; এক পাড়ায় বাড়ি। কেন বলুন তো? ওর মধ্যে অবজেকশনেবল কিছু আছে নাকি?

না না; সেসব কিছু নয়। অন্য ব্যাপার, যার জন্যে তাকে একবার কোর্টে আসতে হবে।

কোর্টে! চমকে উঠল ছেলেটি।

ঘাবড়াচ্ছ কেন? তাকে তো কোনো মামলার আসামী করা হচ্ছে না। সাক্ষী হিসেবে আসবেন।

কিসের সাক্ষী?

সেসব এলেই জানতে পারবেন। তার বাবার নাম, ঠিকানা এইসব বল। কোর্ট থেকে সমন যাবে। সেদিন যেন হাজির হন। ভয়ের কিছু নেই। হাজির না হলে কিন্তু ওয়ারেণ্ট ইস্যু করা হবে বলে দিও। আর তোমাকেও আসতে হবে ঐ মানসী রায়কে আইডেন্টিফাই করার জন্যে।

পুলিশ অফিসার চলে গেলেন।

ছেলের মাথায় দুশ্চিন্তার আকাশ ভেঙে পড়ল। কিসের

জন্যে এই কোর্ট পুলিশ কিছুই ভেবে পেল না। নিজের চেয়েও বেশী ভাবনা হল ঐ মানসীর জন্যে। কোর্টের সমন পেয়ে কি জানি কী করে বসে? তার বাবা আবার নার্ভাস টাইপের লোক।

মফঃস্বলে বাড়ি। সমন যাবে রেজিস্ট্রি ডাকে।

বাড়ি গিয়ে পোস্ট অফিসের পিওনকে দুটো টাকা দিয়ে এই-টুকু রাজী করাল, যে দুটো চিঠিই যেন গোপনে তার কাছে দিয়ে যায়। মানসী রায়ের সই সে এনে দেবে।

কিন্তু মানসীকে তো ব্যাপারটা বলতে হবে। তার বাবাকেও না জানালে চলবে না। সেখানেই বড় ভাবনা। যা হোক করে ম্যানেজ করতেই হবে।

কোর্ট প্রকাশ্য বিচারালয়। সেখানে কোন মামলাই পুরোপুরি গোপন থাকে না। এ কেসটাও চাপা ছিল না, বাদী পক্ষের উকিল যতই চেষ্টা করুন। উকিল মোক্তার মুহুরীরা এবং বাইরের কিছু লোকও জেনে ফেলেছিল।

নারী ঘটিত ব্যাপারে সকলেরই দারুণ কৌতূহল। মানসী রায়ের সাক্ষ্য যেদিন নেওয়া হবে সেদিন কোর্ট বসবার আগে থেকেই সারা ঘরে এতটুকু ফাঁক ছিল না। সেই ভিড়ের পিছনে কোন-রকমে এসে দাঁড়িয়েছিল দীপা।

কিছুক্ষণ পরে হাকিম এলেন এবং তার কয়েক মিনিটের মধ্যে আসামীর কাঠগড়ায় মানব এসে দাঁড়াল। এক পলক তাকিয়েই দীপার বুকের ভেতরটা নড়ে উঠল।

পরক্ষণেই চোখ সরিয়ে নিয়ে নিজেকে শক্ত করবার চেষ্টা করল।

কোর্টের পেয়াদার হাঁক শোনা গেল—মানসী রায় হাজির! মানসী রায় হাজির! মানসী রায়।

এতক্ষণ কোর্টরুমে একটা গুঞ্জন চলছিল। সহসা একেবারে থেমে গেল। সকলের চোখে উৎসুক দৃষ্টি। দেয়াল ঘড়ির টিক টিক ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। সবগুলো ঘাড় দরজার দিকে ফেরানো।

মিনিট কয়েকের মধ্যে দেখা গেল একজন বয়স্ক ভদ্রলোকের হাত ধরে একটি এগার বার বছরের ফ্রকপরা ছিপছিপে গড়নের মেয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। তাকে সাক্ষীর কাঠগড়া পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, কিছু ভয় নেই মা। ওঁরা যা জিজ্ঞেস করেন ঠিক ঠিক উত্তর দিও। আমি এখানেই আছি।

মেয়েটিকে বেশ সপ্রতিভ বলে মনে হল। কাঠগড়ার উপর উঠে আসতেই উল্টো দিকে দাঁড়ানো আসামীর মুখ থেকে আপনা থেকেই বেরিয়ে এল একটি বিস্ময় বিমূঢ় শব্দ—পুঁটি!

হলফনামা পড়ানো হলে কোর্ট সাবইন্সপেক্টর জবানবন্দী শুরু করলেন—

তোমার নাম কী?

ভালো নাম?

হ্যাঁ ভালো নামই বল।

কুমারী মানসী রায়।

পিতার নাম?

তাও বলল মানসী। বাড়ির ঠিকানাও জানাল মালীগাঁ, জেলা বীরভূম।

তুমি কবিতা লেখ?

না।

এই কাগজে তোমার নামে মাঝে মাঝে যে কবিতা বেরোয় সেগুলো তোমার নয়?

না।

কে লেখে ওগুলো ?

সব পানুদা লেখে আমি শুধু কপি করে দিই।

পরের লেখা তুমি কপি করতে যাও কেন ?

পানুদা বলেছে, তোকে আমি অনেক ডিটেকটিভ বই পড়তে দেবো পুঁটি, তুই এগুলো কপি করে দে।

তার নীচে তোমার নামটাও কি তুমি বসিয়ে দাও ?

হ্যাঁ।

কেন ?

এবার যেন একটু লজ্জিত হল সাক্ষী। মাথা নীচু করে মৃদু হেসে বলল পানুদা বলেছে, 'তোর নাম কাগজে ছাপা হবে। সবাই জানবে তুই একজন কবি।'

একটা হাসির রোল উঠল। হাকিমকে হাসতে নেই। গম্ভীর-ভাবে বললেন, অর্ডার অর্ডার।

পরে, সাক্ষী প্রণব মুখার্জি। বাড়ি মালীগাঁ, হেতমপুর কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। ডাক নাম পানু। সে স্বীকার করল, শোহিনী পত্রিকায় মানসী রায়ের নামে যে-সব কবিতা বেরোয় সে-ই তার লেখক।

তোমার লেখা অন্যের নামে ছাপতে দাও কেন ?

প্রণব একটু ইতস্ততঃ করছিল। হাকিম বললেন, বল।

প্রণব আপশোসের সুরে বলল, কি জানেন স্যার। দু বছর ধরে নানা কাগজে অনেক কবিতা পাঠিয়েছি। কেউ ছাপল না। তখন আমার এক বন্ধু বলল, এটা হল আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ। মেয়েদের অনেক বিশেষ সুবিধে দেওয়া হচ্ছে। কবিতাগুলো কোনো মেয়ের নামে পাঠিয়ে দে। ঠিক ছাপবে। তখন পুঁটি, মানে মানসী রায় নাম দিয়ে পাঠাত শুরু করলাম।

—তার পর ?

—কেউ ছাপল না।

বন্ধু বলল, শুধু নাম বসিয়ে দিলেই তো হবে না। হাতের লেখাটাও মেয়েদের মত হওয়া চাই। নৈলে সম্পাদকের সন্দেহ হতে পারে। তখন পুঁটিকে ধরলাম। ওর হাতের লেখা খুব ভালো।

আবার এক দফা হাসি এবং সঙ্গে সঙ্গে হাকিমের 'অর্ডার অর্ডার।'

এবার বাদী পক্ষের উকিল জেরা শুরু করলেন, আপনি যা বললেন তাই যদি সত্যি হয়, কাগজের অফিসে নিজের বা মানসীর ঠিকানা না দিয়ে অন্য একটা ঠিকানা দিলেন কেন ?

মানসীর ঠিকানায় কাগজ গেলে ওর বাবার চোখে পড়বে। তিনি ওকে আস্ত রাখবেন না। আমার বাড়িতে ওর নামে কাগজ এলে নানা কথা উঠবে। তাই বাগবাজারে আমার দাদার ঠিকানা দিয়ে দিলাম।

লেখাগুলো বেরোল কি না বেরোল জানতেন কী করে ?

আমার সেই বন্ধুর কাছ থেকে। সে ঐ পত্রিকাটি রেগুলারলি নেয়।

দাদাকে কিছু জানিয়েছিলেন ?

না স্যার।

কেন ?

শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে যেত ওগুলো আমার লেখা। দাদা আধুনিক কবিতা একদম পছন্দ করেন না। তাছাড়া—

বলুন, থামলেন কেন ?

প্রণব চকিতে একবার উল্টো দিকের কাঠগড়ার দিকে তাকাল।

(মানব মুচকি মুচকি হাসছিল) তারপর মাথা নীচু করে সলজ্জ মৃদু কণ্ঠে বলল, দু-একটা লাভ পোয়েম টোয়েম ছিল কিনা।

এবার যে হাসির তুফান উঠল, হাকিম আর সেটা থামাবার চেষ্টা করলেন না। মনে হল, তাঁর মুখেও যেন তার একটু আভাস দেখা যাচ্ছে।

এই সময়ে একজন একটা চিরকুট এনে বাদী পক্ষের উকিলের হাতে দিল। পড়ে নিয়ে তিনি হাকিমের উদ্দেশে বললেন, ইওর অনার, আমার মক্কেল মামলা চালাতে চান না।

বেশ। উইথড্রয়াল পিটিশন দিন।

প্রাণতোষবাবুর শরীরটা একটু খারাপ হওয়ায় সেদিন হাইকোর্টে যান নি। বাড়ির গাড়ি নিয়ে এসেছিল দীপা। ভিড় ঠেলে বাইরে এসে সেদিকে যাচ্ছিল। পিছন থেকে ছুটতে ছুটতে এল প্রণব—বৌদি তোমার গাড়ি কই ?

ঐ তো।

চল, আমি তোমার সঙ্গে যাবো।

কোথায় ?

কোথায় আবার ? বাগবাজারে।

তোমার দাদা কোথায় ?

দাদা পুঁটি আর তার বাবাকে ট্রেনে তুলে দিতে গ্যাছে। ফিরে আসার আগেই আমরা পৌঁছে যাবো।

আমি কী করে যাই ? মাকে তো বলা হয় নি। তাছাড়া কাপড় চোপড়—

সে আবার একটা প্রবলেম নাকি ? আমি এই গাড়িতেই ভবানীপুরে গিয়ে মামাকে বলে তোমার স্যুটকেস-ফুটকেস নিয়ে একটা ট্যাক্সি করে চলে যাবো।

দীপাকে চুপ করে থাকতে দেখে বলে উঠল, অত ভাবছ কী?

একটা কথা বলবে?

কী, বল না?

দীপার ঠোঁটে চাপা হাসি। বলল, তোমার দাদাকে না হয় লাভ পোয়েন-টোয়েম দেখান যায় না। আমার কাছে বলতে কি বাধা ছিল?

তোমার কাছে বলতে বাধা! কী যে বল? আসবো আসবো করেও আসা হয় নি বৌদি। সব আমার দোষ, আমার ভুল। তখন কি জানি—

থাক ও কথা। ভুল আমিও কম করিনি।

সব কিছুর জন্যে দায়ী আমি। যাক যা হবার তা হয়ে গেছে। আজ তোমাকে আমি নিয়ে যাবোই।

প্রণব তার দাদার ঠিক উল্টো; ভীষণ ছটফটে। বেশী কথা বলে আর যা বলবে তখখনি না করে ছাড়বে না। তাছাড়া বৌদিকে সে ভীষণ ভালবাসে। দীপারও শুরু থেকেই এই প্রাণচঞ্চল দেওরটির উপর একটা স্নেহের টান পড়ে গিয়েছিল।

প্রণব আবার তাড়া দিল, কী হল? দাঁড়িয়ে রইলে কেন? চল।

ড্রাইভার নেই দেখছ না?

সে আবার কোথায় গেল?

চা-টা খেতে গ্যাছে বোধ হয়।

বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে। কেনাকাটা যোগাড়-যন্তর সব তো আমাকেই করতে হবে।

দীপা অবাক হল—'কিসের কেনা-কাটা!'

প্রণব কাছে সরে এসে চাপা গলায় বলল, বাঃ আজকের এই ইভেণ্টটা সেলিব্রেট করতে হবে না? এত কাণ্ডের পর ইউ আর গোয়িং টু বি রি-ইউনাইটেড। বাংলায় কী বলব? মধুর পুনর্মিলন!

বড্ড ফাজিল হয়েছ আজকাল।

ধমক খেয়ে মুখ নীচু করে মাথার পিছনটা চুলকোতে লাগল প্রণব।

তারপর হঠাৎ বলে উঠল, এই তো ড্রাইভার এসে গ্যাছে। চল।